সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট পথিকৃৎ বিজ্ঞানীরা

অধ্যাপক অশোক কুমার ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০১০

সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট পথিকৃৎ বিজ্ঞানীরা

অশোক কুমার ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
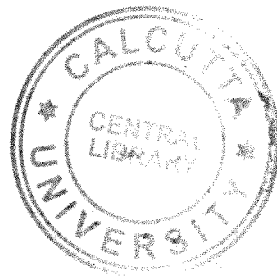
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

History of Marine Geology and the Associated Pioneering Scientists

by

Asok Kumar Bhattacharya

নিবন্ধক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ হতে
প্রকাশিত এবং শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ, অধীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়,
৪৮, হাজরা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে মুদ্রিত।

Regd. No. 2640B

মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার পরম আরাধ্য পিতৃদেব স্বর্গীয়
জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও মাতৃদেবী স্বর্গীয়া
রমা দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত।

কিছু মহাসাগরাভিযানের মৌন-মুখর সাক্ষ্য

ডঃ কল্যাণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রাক্‌কথন" ও "তথ্যসূত্র"-এর মোড়কে আবৃত-১৯টি পরিচ্ছেদ, ৫৬টি চিত্র ও উপসংহার বিন্যাসে বিধৃত—অধ্যাপক অশোক কুমার ভট্টাচার্য রচিত "সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানের ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট পথিকৃৎ বিজ্ঞানীরা" গ্রন্থটি (পাণ্ডুলিপি) ব্যতিক্রমী দৃষ্টিকোণ-লব্ধ একটি সুবিন্যস্ত "কোলাজ"।

এটি "কোলাজ"-ধর্মী এই কারণে আপাতদৃষ্টিতে যে কোনো বিষয়ের "...ইতিহাসটা দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা।..." অধ্যাপক ভট্টাচার্যের অনুসৃত তাঁর বিষয়টির উপস্থাপন পদ্ধতিও নির্ভর করেছে, আকস্মিক কিছু পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কারের ধাক্কার ওপর—

ব্যবসায়ের তাগিদে বা পরস্বাপহরণের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত সামুদ্রিক অভিযানের দিনলিপি থেকে আহৃত তথ্যের সংকলন, বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানী সমুদ্রযাত্রা ও সহায়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং একালের উন্নত গবেষণাগার সমৃদ্ধ সমুদ্রযানে করে বিজ্ঞানীদের কালক্রমানুসারী সমুদ্রের অতলান্ত গভীর' অঞ্চলের রহস্য উদঘাটনের প্রয়াস থেকে বিশ্লেষণমূলক যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বের আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

"যাহা যত গভীর তাহা ততই রহস্যময়..."

সামুদ্রিক গভীরতার মধ্যে ডুব দিয়ে রহস্যের জাল ছিঁড়ে লেখকের সত্যানুসন্ধানের দুরূহ প্রয়াস অভিব্যক্ত!

গ্রন্থটির অভিনবত্ব:

* লেখকের অনুসৃত পদ্ধতি অনন্য।
* যতদূর জানি, বাংলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ এখনও আত্মপ্রকাশ করেনি।
* সমুদ্র-অনুসন্ধায়ী ও বিজ্ঞানীদের কম পক্ষে দুর্লভ ২৭টি আলোকচিত্র সংযোজিত।
* বাংলা পরিভাষা সমৃদ্ধ প্রাঞ্জল উপস্থাপন।

উপসংহারে জানাই— "সৃষ্টির কাজে প্রকাশের ব্যগ্রতা
ইতিহাসটারে গোপন করে সে রাখে
জীবনলক্ষ্মী মেলিয়া রঙের রেখা
ধরার অঙ্গে আঁকিছে পত্রলেখা
ভূতত্ত্ব তার কঙ্কালে ঢাকা থাকে।

(নবজাতক—রবীন্দ্রনাথ)

সেই ভূতত্ত্বকে প্রকাশের প্রয়াস প্রশংসার্হ!
গ্রন্থটি সমাদরের যোগ্য।

প্রাক্ কথন—

সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ে মানুষের কৌতুহল অন্তহীন। এই বিজ্ঞানের প্রধান বিভাগগুলি হ'লো সামুদ্রিক ভূবিদ্যা (Geological Oceanography), সামুদ্রিক ভৌতবিদ্যা (Physical Oceanography), সামুদ্রিক রসায়ণবিদ্যা (Chemical Oceanography) ও সামুদ্রিক জীববিদ্যা (Biological Oceanography)। এই চার প্রধান বিভাগ ছাড়াও সমুদ্রকে জানার ও এর জৈব ও অজৈব সম্পদ্‌কে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আজ সমুদ্র-বিজ্ঞান সম্পর্কিত আরো অনেক নতুন-নতুন বিষয়ের সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার মধ্যে সামুদ্রিক ভূবিদ্যার স্থান বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই কারণে যে সাগর মহাসাগরের সৃষ্টি, তাদের ভূ-তাত্ত্বিক পরিবেশ, এর জলরাশি ও এর জৈব ও অজৈব সম্পদ আবার সমুদ্রবিজ্ঞানের অন্যান্য সব বিভাগের ধারক ও বাহক। এছাড়া সামগ্রিকভাবে ভূবিদ্যার (Geology) পাঠও সামুদ্রিক-ভূবিদ্যাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। এর কারণ পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ৭১ শতাংশই সাগর-মহাসাগরে আবৃত।

যে কোনও বিজ্ঞান-বিষয়ের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্টির আদিমতম ইতিহাসকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা। ঠিক একই ভাবে সামুদ্রিক ভূবিদ্যার কথা লিখতে গিয়ে এর ইতিহাসের প্রসঙ্গও স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে। সমুদ্রের আহ্বানে, দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দেওয়ার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরে সমুদ্র অভিযানের সমস্ত প্রতিকূলতা ও ভয়াবহতাকে তুচ্ছ করে কত রকমের অভিযান চালিয়েছে তার ইয়ত্বা নেই। ইউরোপীয় জলদস্যুরা যেদিন বাণিজ্যিক স্বার্থে সাগর-মহাসাগর অতিক্রম করেছিল, সেদিন শুধু বাণিজ্যিক লাভই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠেনি। এদের সমুদ্র পরিক্রমা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল মহাসাগরের বুকে ছাড়ান-ছেঁটানো দেশ, মহাদেশ, দ্বীপ-দ্বীপমালা সহ নতুন নতুন সমুদ্র পথ, সমুদ্র-স্রোতের গতি-প্রকৃতি, উপকূলীয় ভূখণ্ডের পলি-পাথর ও জীব-বৈচিত্রের নানান বৈজ্ঞানিক তথ্য। এইসব কাহিনীকে সমুদ্র বিজ্ঞানের আদিপর্বের পরিচ্ছেদে মোট্যামুটিভাবে ক্রমানুসারে সাজান হয়েছে।

এর পরের পরিচ্ছেদগুলিতে সামুদ্রিক-ভূবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সমুদ্রবিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিভিন্ন গবেষণা জাহাজ, সমুদ্রতল ছেঁদন উপযুক্ত নানা যন্ত্রপাতি ও গবেষণাগার সম্বলিত জাহাজ থেকে আধুনিকতম সামুদ্রিক-ভূবিদ্যার বিষয় ও প্রযুক্তির প্রয়োগের ধারাবাহিকতা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। সবশেষ পরিচ্ছেদে আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান সহ সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানের গবেষণায় ভারতের কৃতত্ব ও পথিকৃৎ বিজ্ঞানীদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সংযোজিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইংরাজি বা বাংলাভাষায় এ ধরণের

কোন পূর্ণাঙ্গ পুস্তকের কথা লেখকের জনা নেই। সমস্ত পুস্তকই যেমন প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও ওয়েবসাইটে সংকলিত তথ্যের সমাহার, এই পুস্তকটিও এর ব্যতীক্রম নয়। যে সমস্ত পুস্তক ও উৎস থেকে এই পুস্তকের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, তাদের প্রকাশক ও লেখকদের কাছে লেখকের ঋণ অপরিসীম। এই পুস্তকের শেষে তথ্যানুসন্ধানের বিভিন্ন সূত্রের একটি তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

বাংলায় বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনায় বাংলা পরিভাষার সমস্যা থেকেই যায়। বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের বাংলা তর্জমায় যতদূর সম্ভব সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত ভূবিজ্ঞান কোষ ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি নির্দিষ্ট পরিভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত পথিকৃৎ সমুদ্রবিজ্ঞানী, সামুদ্রিক-ভূবিজ্ঞানী ও অন্যান্য চিত্র এই পুস্তকের বিশেষ আকর্ষণ হবে বলে বিবেচনা করি। পুস্তকটি পাঠকবর্গের, বিশেষ করে ছাত্র সমাজের ভাল লাগলে সবিশেষ উৎসাহিত হবো। এই পুস্তকের বিষয় বস্তুতে বিজ্ঞানমনস্ক সাধারণ পাঠক থেকে সমুদ্রবিজ্ঞানের, বিশেষত সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের একটি বড় অংশ সংকলিত হয়েছে। ড: কামাখ্যা পদ বিশ্বাস বাংলায় এই পুস্তক রচনার ব্যাপারে ও পাণ্ডুলিপি পরিবর্ধনে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার গবেষক ছাত্রী মৌসুমী চ্যাটার্জী ও পুত্র অপ্রতিম বিজ্ঞানীদের ছবিগুলি ক্যামেরা ও কমপিউটারের মাধ্যমে প্রসেসিং-এ প্রভূত সাহায্য করেছে। আমার স্ত্রী অণিতা ও কন্যা অপরাজিতা আমাকে এই বিষয়ে লেখার জন্য প্রভূত প্রেরণা জুগিয়েছে। ধন্যবাদের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে তাদের ছোট করতে চাই না।

অশোক কুমার ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদ-১

সমুদ্র অভিযানের আদি পর্বে প্রযুক্তির চিন্তা ভাবনা

অতল সমুদ্রের গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটনে নানাবিধ সমুদ্র প্রযুক্তি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রয়োগও চলছে দ্রুত লয়ে। প্রতিদিনই সমুদ্র প্রযুক্তির নতুন নতুন দিক আবিষ্কৃত হওয়ায় সমুদ্র তলের বহু রহস্যই এখন মানুষের গোচরে। কিন্তু সমুদ্র অভিযানের আদিম পর্বে পরিস্থিতি এমন ছিল না। তখন মানুষ সমুদ্রকে দেখেছে তার অনন্ত জলরাশির প্রকান্ড কান্ডের মধ্যে। তার অতল জলের গভীরে যাওয়ার প্রযুক্তি চিন্তা তখনও মানুষের মাথায় আসে নি। সমুদ্রের গভীরে নামার প্রযুক্তি চিন্তার প্রথম সন্ধান আমরা পাই খ্রিস্টপূর্ব ৩৬০ সালে যখন অ্যারিস্টটল্ গভীর সমুদ্রে নামার জন্য ব্যারেল আকৃতি একটি যন্ত্রের প্রয়োগের কথা বলেন। এরপর খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ সালে আলেকজান্ডার দি গ্রেট পৃথিবী জয়ের আশায় বেরিয়ে সমুদ্রের গভীরে নামার জন্য কাঁচের তৈরি ব্যারেল আকৃতির একটি ডুবুরি ঘন্টা (Diving bell) ব্যবহার করেছিলেন। সুপ্রাচীন এই সব ঘটনা প্রমান করে যে শুধু তত্ত্বে নয় সমুদ্র প্রযুক্তির জন্ম হয়েছিল আজ থেকে দুহাজার তিনশো বছরেরও আগে।

রত্নাকর সমুদ্রকে মানুষ কিভাবে কাজে লাগাবে, ব্রিটিশ ভবিষ্যদ্বক্তা মাদার শিপ্‌টনের (১৪৮৮-১৫৬১) ভবিষ্যৎ বাণীটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন—

"Under water men shall walk, shall ride, shall sleep and talk"

গভীর সমুদ্রে নামার জলযান সাব্‌মার্সিবেলের সাহায্যে শিপ্‌টনের প্রতিটি স্বপ্ন আজ বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। অচেনা, অজানা মহাসমুদ্রের গভীরে মানুষ আজ বিচরণশীল। এর অনন্ত রহস্যের দুর্ভেদ্যতাকে নতুন থেকে নতুনতর জ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোকে জয় করে সমুদ্র বিজ্ঞানের আলোর দিশারীরা অবলীলায় এগিয়ে চলেছেন।

সামুদ্রিক ভূবিদ্যার (Marine Geology) পরিসর

সামুদ্রিক ভূবিদ্যা বলতে আমরা সমুদ্র অঞ্চলের অর্থাৎ সমুদ্রে সীমাবদ্ধ নোনাজল পরিবৃত্ত অঞ্চলের ভূবিদ্যার কথা বুঝি। যেহেতু পৃথিবী পৃষ্ঠের ৭১ শতাংশই সমুদ্র, সেহেতু ভূবিদ্যার পাঠের সুযোগ ও প্রয়োজন দুই-ই হয়েছে সমুদ্র অঞ্চলকে অবলম্বন করে। সাগরের বেলাভূমি, সামুদ্রিক জলাভূমি থেকে উপকূলীয় নোনা জলের হ্রদ, মহীসোপান মহীঢাল হয়ে গভীর সমুদ্র তল, সমুদ্রখাত ও সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জ সবই সামুদ্রিক ভূবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত। আবার মহাদেশীয়

অঞ্চলের যে সব জায়গা অতীত সমুদ্রের সাক্ষী বহন করছে তাদের রহস্যের কিনারা করতেও সামুদ্রিক ভূবিদ্যার জ্ঞান অপরিহার্য।

সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানী পি এইচ্ কুইনেন্ (P.H. Kuenen) ১৯৫৮ তে লেখা তাঁর একটি গবেষণা পত্রের নামাকরণ করেন "No Geology without Marine Geology", অর্থাৎ ভূবিদ্যা, সামুদ্রিক-ভূবিদ্যা ছাড়া অস্তিত্বহীন। সামুদ্রিক-ভূবিদ্যা আবার ভীষণভাবেই সামুদ্রিক ভূভৌতবিদ্যার (Marine Geophysics) উপর নির্ভরশীল কারণ গভীর সমুদ্র ত্বকের স্তরবিন্যাস ও গাঠনিক জটিলতা বোঝার জন্য ভূকম্পতরঙ্গের (Seismic Waves) উচ্চবিশ্লেষণী ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিফলন ও প্রতিসরণের উপর নির্ভর করতে হয়। সামুদ্রিক ভূবিদ্যার সাহায্যে আমরা সমগ্র পৃথিবীর সমুদ্র অঞ্চলের গঠন, ইতিহাস ও বিবর্তনের ধারাটিকে সঠিকভাবে জানতে পারি।

পরিচ্ছেদ-২

সমুদ্র অভিযানের আদিপর্ব

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলকেই প্রথম সমুদ্র জীববিজ্ঞানীর (Marine Biologist) সম্মানে ভূষিত করা যায় কারণ সেই সুদূর অতীতে ইনিই প্রথম বহু প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর সন্ধান ও বর্ণনা দিয়েছিলেন, যা আজও জীব বিজ্ঞানে স্বীকৃত ও সমাদৃত। মাছের কান্‌কো বা গিল্ (gill) যে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র, এ তথ্যও আমরা প্রথম পেয়েছি অ্যারিস্টটলের লেখা বিবরণ থেকে।

এরপর নরওয়ের সমুদ্র দস্যুরা (Vikings) নবম থেকে দশম শতকে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে তাদের অভিযান চালিয়েছিল। ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে এরাই লেফ্ এরিকসনের (Leif Eriksson) নেতৃত্বে উত্তর আমেরিকা আবিষ্কার করে। আরবের বাণিজ্যিক নৌবহরগুলি এই সময়েই আফ্রিকা, উত্তর-পূর্ব এশিয়া ও ভারতের দিকে সমুদ্র অভিযান চালিয়ে সমুদ্র-স্রোত ও সমুদ্র-বায়ুর গতিবিধির বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে।

ভাইকিংদের পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টফার কলম্বাসই (Christopher Columbus) (১৪৫১-১৫০৬) প্রথম ইউরোপীয়ান (সম্ভবত এর জন্ম ইটালীর জেনোয়ায়) যিনি একাধীক বার সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। পেশায় নাবিক কলম্বাস তিন-তিনটি অভিযানের মধ্য দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে ১৪৯২-তে আমেরিকা (New World) ও ১৪৯৮তে দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। কলম্বাসের ধারণা হয়েছিল, তিনি ভারতে পৌছেছেন, তাই দক্ষিণ আমেরিকার "নেটিভদের" "রেড্ ইন্ডিয়ান" বলে ভেবে নিয়েছিলেন।

সেই সময় ইউরোপীয়রা বাণিজ্যের স্বার্থে সমুদ্রপথে ভারতে পৌছনোর জন্য বহু ব্যয়বহুল প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল এবং এরই ফলস্বরূপ ১৪৯৭-র ৮ জুলাই পর্তুগীজ যোদ্ধা ও নাবিক ভাস্কো-দা-গামা (১৪৬০-১৫২৪) (Vasco-Da-Gama) আটলান্টিক মহাসাগর ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ প্রান্তের গুড্ হোপ অন্তরীপ (Cape of Good Hope) প্রদক্ষিণ করে ভারত মহাসাগরে পৌছান। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের মোম্বাসা ও মিলান্তিতে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করে ভারত মহাসাগরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অতিক্রম করে ১৪৮৯-র ২০শে মে ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত কেরালার কালিকটে ও পরে গোয়ায় পৌছান। পর্তুগালের লিনবন থেকে আর্টলান্টিক ও ভারত মহাসাগর ধরে ভারতে আসার এই সমুদ্র পথটি ভাস্কো-দা-গামার আবিষ্কার। তাঁর যাত্রাপথের সূচক হিসাবে আফ্রিকার মিলিন্ডায় "Pillar of Vasco-Da-Gama" আজও দাঁড়িয়ে আছে।

ভাস্কো-দা-গামার ভারতে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল কালিকটের আরব বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করে ভারতের সম্পদ লুট করে পর্তুগালে ফেরা। তার প্রথমবারের অভিযান সফল হওয়ায় ১৫০২-এর ১২ ফেব্রুয়ারী ২০টি যুদ্ধজাহাজের বহর নিয়ে ভাস্কো-দা-গামা ১৫০২-এর ৩০শে অক্টোবর দ্বিতীয়বারের জন্য কালিকট পৌঁছান। ভারত থেকে প্রচুর সোনা ও সিল্ক নিয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফেরার পর তৎকালীন পর্তুগাল রাজ তাকে তৃতীয় বারের জন্য ভারতে পাঠান। ১৫২৪-এ ভাস্কো-দা-গামা তৃতীয় বারের জন্য গোয়ায় পৌঁছান, কিন্তু ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হয়ে ১৫২৪-এর ২৪শে ডিসেম্বর কোচিন শহরে মারা যান। ফোর্ট কোচিনের St. Francis গির্জায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। পর্তুগালের লিসবন থেকে ভারতে আসার সুদীর্ঘ সমুদ্র পথ আবিষ্কারই ভাস্কো-দা-গামার শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমুদ্রকে জানার কৌতুহল তখনো শুরু হয়নি। কিন্তু জলদস্যুতা, লুণ্ঠন ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয়দের এই সব দুঃসাহসী অভিযানের ফলে সমুদ্র পথে দেশ-দেশান্তরে পাড়ি দেওয়ার সাহস ক্রমশ বাড়তে থাকে। হয়তো বা এই সব অভিযানের মধ্যেই সুপ্ত ছিল মহাসাগরকে জানার অদম্য স্পৃহা, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে সমুদ্র গর্ভে বৈজ্ঞানিক অভিযানের ধারাবাহিক প্রবাহ! ভাস্কো-দা-গামার সমুদ্র অভিযানের প্রায় ৩০ বছর পর পর্তুগীজ নাবিক ও অভিযাত্রী ফারডিন্যান্ড ম্যাগেলান (১৪৮০-১৫২১) (Ferdinand Magellan) সমুদ্র পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। পর্তুগালে থাকার সময় ১৫০৫ সাল থেকে ম্যাগেলান ইস্ট-ইন্ডিস ও আফ্রিকা অভিমুখে একাধীক অভিযান চালিয়েছিলেন কিন্তু পর্তুগালের তৎকালীন রাজা ম্যানুয়াল-১ (Manual-I)-এর কাছ থেকে তার নৌবাহিণিতে কোনও উচ্চ পদ না পাওয়ায় ম্যাগেলান স্পেনে চলে যান ও স্পেনের রাজা চার্লস্-১-এর (Charles-I) অধীনে সমুদ্র অভিযান আরম্ভ করেন।

১৫১৯ সালের সেপ্টেম্বরে ৫টি জাহাজ ও ২৭০ জনের নৌবহর নিয়ে স্পেনের Sanlucar de Barrameda থেকে যাত্রা শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ প্রান্তে ৫২ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশের একটি সরু পথ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছান। ঐ সমুদ্র পথটিই পরে তাঁর নামাঙ্কিত হয়ে ম্যাগেলান অন্তরীপ (Magellan Strait) নামে পরিচিত হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাড়ি দিয়ে ১৫২১-এর ১৫ই মার্চ ম্যাগেলান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। কিন্তু সেই বছরেই ঐ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে ম্যাগেলান নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নৌবহরেরই এক নাবিক সেবেষ্টিয়ান ডেল ক্যানো (Sebastian del Cano) ভিক্টর নামের একটি জাহাজ নিয়ে ম্যাগেলানের পৃথিবী প্রদক্ষিণের অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন। ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে ১৫২২-এ Sebastian স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করার সময় ম্যাগেলান ঐ মহাসাগরের গভীরতা মাপার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই চেষ্টা সফল হয়নি।

পরিচ্ছেদ-৩

সমুদ্র পথে উইলিয়াম ড্যামপিয়ের-এর পৃথিবী প্রদক্ষিণ ও সমুদ্রবিজ্ঞানে নব দিগন্তের উন্মোচন।

১৬০০ খ্রিষ্টব্দের সব চেয়ে দুঃসাহসী সমুদ্র অভিযাত্রী উইলিয়াম ড্যামপিয়ের-এর (চিত্র-১) (১৬৫২-১৭১৫) (William Dampier) জন্ম ইংল্যাণ্ডের সোমারসেটের (Somerset) ইস্ট কোকারে (East Coker)। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই ড্যামপিয়ের সমুদ্র যাত্রায় সাহসী হয়েছিলেন। জলদস্যু হিসাবে পরিচিত ড্যামপিয়ের বহু নতুন মহাদেশ, দ্বীপমালা ও সামুদ্রিক প্রণালী আবিষ্কারের জনক। এছাড়াও ড্যামপিয়ের ছিলেন নতুন নতুন সমুদ্র পথের অনুসন্ধানী। আবিষ্কারের উন্মাদনায় বহু সমুদ্র অভিযানের কান্ডারী ও সর্বোপরি অতি সূক্ষ বিজ্ঞান বিষয়ের পর্যবেক্ষক। ইনিই প্রথম ইংরেজ যিনি বিশাল সমুদ্র অভিযানের পর অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির বহু অঞ্চলে বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুসন্ধান চালিয়ে সুদূর অতীতে ঐ দুই ভূখন্ডের নির্ভুল মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। সেই সময় অস্ট্রেলিয়া, নিউ-হল্যান্ড নামে পরিচিত ছিল। ড্যামপিয়েরই প্রথম অভিযাত্রী যিনি সমুদ্র পথে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সমগ্র পৃথিবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করার অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী।
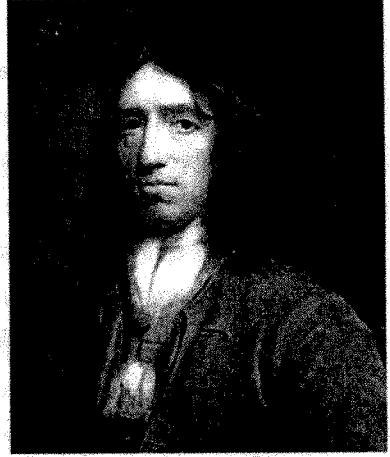
চিত্র-১: উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ের

১৬৭০-এর দশকের শেষ ভাগে মধ্য আমেরিকার স্প্যানিশ মেইনের (Spanish Main) জলদস্যুদের সঙ্গে নাবিক হিসাবে দুবার 'বে অফ্ ক্যাম্পে' (Boy of Campe) ভ্রমণ করেন। এরপরই তাঁর জলদস্যুতার প্রবণতা বেড়ে যায়। ড্যামপিয়ের প্রথমবারের মত জলপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন ১৬৭৯-তে। ক্যারিবিয়ান সাগর ও মধ্য আমেরিকার জাড়ি প্রদেশ, জাড়ি প্রণালী ও পানামা যোজক অতিক্রম করার সময় লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে আকস্মিক হানা দিয়ে বেশ কিছু স্প্যানিশ জাহাজ অধিকার করেন। এরপর ক্যারিবিয়ান সাগরে ফিরে আমার আগে ড্যামপিয়ের স্প্যানিশ বসতিতে হানা দিয়ে সেখানকার আদিম আধিবাসীদের সর্বস্য লুট করেন।

১৬৮৩-তে ভারজিনিয়ায় যাত্রাকালে ড্যামপিয়ের একটি যুদ্ধ জাহাজের মাস্টার-নাবিক কুকের (Cook) সহযোগী হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের কেপ্ হর্ণে (Cape Horn) প্রবেশ করেন।

সেখানে এক বছর থাকার সময় ড্যামপিয়ের ও কুক স্প্যানিশ অধিকৃত পেরু, গালাপাগোস ও মেক্সিকোর বসতিগুলিতে হানা দিয়ে তাদের যাবতীয় সম্পদ লুট করে নেন। এই অভিযানে তারা বহু জাহাজ ও জলদস্যু সংগ্রহ করেন ও এক সময় ১০টি জাহাজের একটি বাহিনী নিয়ে সমুদ্র অভিযান চালান। কিন্তু মেক্সিকোতে অবস্থানকালে কুকের মৃত্যু হয় ও সেই জাহাজের নেতৃত্বে আসেন ক্যাপ্টেন ডেনিস্। ডেনিসের সঙ্গে সমঝোতা না হওয়ায় ড্যামপিয়ের ক্যাপ্টেন সোয়ানের জাহাজ সিগ্‌নেটে বদলী হন। ১৬৮৪-র ৩১শে মার্চ প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে ড্যামপিয়ের ইস্ট ইন্ডিসে লুণ্ঠন চালান। এর পর সোয়ান সহ ৩৬ জন জলদস্যুকে নিয়ে ড্যামপিয়ের ম্যানিলা, পুলো কনডোর, চিন ও স্পাইস দ্বীপ অতিক্রম করে অস্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

১৬৮৮-র প্রথম দিকে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে কিং সাউন্ড-এর কাছে সিগ্‌নেটে ফাটল ধরে। মেরামতির জন্য সিগ্‌নেটকে পাড়ে তুলে রাখতে হয়। ড্যামপিয়েরের তখনো কোন বিশ্রাম ছিল না। ঐ সময় তিনি অস্ট্রেলিয়ার প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। সেই বছরেরই শেষের দিকে সিগনেট ও আরো দুটি জাহাজ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কোন একটিতে আটকে পরে। তখন ড্যাম্‌পিয়ের ও তার সঙ্গীরা ছোট একটি জলযান তৈরি করে সুমাত্রার অচীনের দিকে রওনা হন। সেখানকার অনুসন্ধান শেষে গুড্ হোপ অন্তরীপ হয়ে ১৬৯১-তে ইংল্যান্ড ফিরে আসেন। অভিজ্ঞতার ভান্ডারে পরিপূর্ণ থাকলেও সুদীর্ঘ সমুদ্র অভিযানের ব্যয়ভার বহন করে ড্যাম্‌পিয়ের তখন প্রায় কর্পদকহীন, নিঃস্ব।

১৬৯৭-তে ড্যাম্‌পিয়েরের "নিউ ভয়েজ রাউন্ড দি ওয়াল্ড" (New Voyage Round the World) নামের পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ড্যাম্‌পিয়েরের বিবরণ পড়ে তৎকালীন ব্রিটিশ নৌবিভাগের (Admiralty) কর্তা ব্যক্তিরা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে ১৬৯৯-তে ড্যাম্‌পিয়েরকে এইচ্ এম্ এস্ রিবাক (H.M.S. Roebuck) নামের জাহাজের কমান্ডার করে অস্ট্রেলিয়া ও নিউ গিনিতে বৈজ্ঞানীক অনুসন্ধানের জন্য নিয়োগ করেন। ১৪ই জানুয়ারী ১৬৯৯তে যাত্রা শুরু করে ড্যাম্‌পিয়ের ১৬৯৯-এর জুলাইতে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে শার্ক বে-র (Shark Bay) মুখে ডার্ট হারটগ্ (Dirt Hartog) দ্বীপে পৌঁছে যান। জলের সন্ধানে তিনি উপকূলের উত্তর-পূর্বে 'ড্যাম্‌পিয়ের আরচিপেলাগো' (তারই নামে নামাকরণ হয়েছিল) ও তার পরে রিবাক্ উপসাগরে (Roebuck Bay) পৌঁছান। কিন্তু সেখানে কাউকে না পেয়ে ড্যাম্‌পিয়ের টিমর দ্বীপের (Timor Island) দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। এর পরই ১লা জানুয়ারী ১৭০০-তে তিনি নিউ গিনির সন্ধান পান। পূর্বদিকে এগিয়ে যেতেই ড্যাম্‌পিয়ের নিউ হ্যানোভার (New Hanover), নিউ আয়ারল্যান্ড (New Ireland) ও নিউ ব্রিটেন (New Britain) দ্বীপ মালার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলকে দেখতে পান। পরে এই দ্বীপমালা, (যা বর্তমানে বিস্‌মার্ক দ্বীপ বা Bismark Islands নামে পরিচিত) ও নিউ গিনির মধ্যবর্তী প্রণালীর নামাকরণ হয় ড্যাম্‌পিয়ের প্রণালী।

পরিচ্ছেদ-৩

ইংল্যান্ড ফেরার পথে ১৭০১-এর ২১শে ফেব্রুয়ারী রিবাক (Roebuck) এ্যাসেনশন্ দ্বীপের (Ascension Island) কাছে ডুবে যায়। ড্যাম্পিয়ের তার সঙ্গী নাবিকদের নিয়ে পাঁচ সপ্তাহের জন্য এ্যাসেনশন্ দ্বীপে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে আটকে পরেন। পরে ৩রা এপ্রিল একজন ইস্ট ইন্ডিয়ান তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে। সেই বছরেরই অগাস্টে ড্যাম্পিয়ের ঘরে ফিরে আসেন।

রিবাক ডুবিতে তাঁর সংগৃহীত ভ্রমণ বৃত্তান্তের বহু তথ্যপূর্ণ দলিল হারিয়ে গেলেও, ড্যাম্পিয়ের অস্ট্রেলিয়া ও নিউ গিনির উপকূলীয় অঞ্চলের অগভীর সমুদ্রের মানচিত্র, সমুদ্র স্রোত ও বাণিজ্যিক বিষয়ের বহু তথ্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দেশে ফেরার পর দুর্ভাগ্যবশতঃ ড্যাম্পিয়ের-এর কোর্ট মার্শাল হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে দেশ থেকে যাত্রার সময় পথে তিনি তার সঙ্গী নাবিক জর্জ ফিসারের (George Fisher) প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করে তাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে ব্রাজিলের জেলে বন্দী করে রেখে এসেছিলেন।. জেল থেকে ফিরে এসে ফিসার ব্রিটেনের রয়াল নেভির কাছে ড্যাম্পিয়েরের বিরুদ্ধে নালিশও করেন। ক্রুদ্ধ ড্যাম্পিয়ের এর উত্তরে ফিসারের প্রতি তাঁর আচরণের বিষয় নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে একটি উত্তর দেন যা তৎকালীন রয়াল নৌবহরের কর্তাদের পছন্দ হয়নি। তাই তারা ড্যাম্পিয়েরকে দোষী সাব্যস্ত করে তার বেতন কেটে নেয় ও রয়াল নেভি থেকে বরখাস্ত করেন। ড্যাম্পিয়ের কিন্তু নিরুদ্যম হওয়ার পাত্র ছিলেন না। এই সময় তিনি ১৬৯৯ থেকে ১৭০১ এর মধ্যে তার অস্ট্রেলিয়া ও নিউ গিনি সহ বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ অভিযানের এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ "এ ভয়েজ টু নিউ হল্যান্ড" (A Voyage to New Holland) নামে প্রকাশ করেন। এর চাঞ্চল্যকর বিবরণ পড়ে রয়াল নেভির কর্তারা ড্যাম্পিয়েরকে দ্বিতীয়বারের জন্য সমুদ্র পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণের সুযোগ করে দেয়।

১৭০৩-এ দুটি সরকারী জাহাজের কমান্ডার হিসাবে তাকে দক্ষিণের মহাসাগর (Southern Ocean) অভিযানে পাঠান হয়। প্রথম জাহাজ সেন্ট জর্জ-এ (Saint George) ১২৬ জনের একটি দল ও দ্বিতীয় জাহাজ সিঙ্ক্ পোর্টস্-এ (Cinque Ports) ৬৩ জনের একটি দল নিয়ে নৌবহর সাজানো হয়েছিল। কিন্তু সিঙ্ক পোর্টস্ এর মাস্টার-নাবিক আলেকজান্ডার সেলকার্ক-এর (Alexander Selkirk) সিঙ্ক পোর্টস্-এর মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার উপযুক্ততা নিয়ে সংশয় ছিল। ড্যাম্পিয়েরের সঙ্গে এই নিয়ে তার মতোবিরোধ হয়। ১৭০৪-এর অক্টোবরে প্রশান্ত মহাসাগরে, বর্তমানে চিলির অন্তর্ভুক্ত জন-মানবহীন জুয়ান ফারনান্ডেজ্ (Juan Fernandez) দ্বীপে এই অভিযান শেষ করতে হয়। কারণ সেলকার্কের অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে সিঙ্ক্ পোর্টস্ ডুবে যায়। সঙ্গে এই জাহাজের বহু নাবিকেরও মৃত্যু হয়। সেলকার্ক কিন্তু জুয়ান ফারনান্ডেজে একা থেকে গিয়েছিলেন। ফলে প্রায় সাড়ে চার বছরের জন্য ঐ দ্বীপে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে বাধ্য হন। সেন্টজর্জের কমান্ডার ড্যাম্পিয়ের অভিযান শেষে ১৭০৭-এ ইংল্যান্ড ফিরে আসেন। এরপর ১৭০৯-এ তার "এ

কেন্টিনিউয়েশন অফ্ এ ভয়েজ টু নিউ হল্যান্ড'' প্রকাশিত হয়। সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে ড্যাম্পিয়েরের এই দ্বিতীয় সমুদ্র অভিযান খুব বেশী সফল হয়নি।

ড্যাম্পিয়েরের তৃতীয় সমুদ্র পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণের অভিযান আরম্ভ হয় ১৭০৮-এ। এই সময় তিনি বেসরকারী ডিউক্ (Duke) জাহাজের মাস্টার নাবিক উডস্ রোর্জাসের (Woodes Rogers) সঙ্গী হয়ে এই অভিযানের পরিকল্পনা করেন। ড্যাম্পিয়েরের এই তৃতীয় অভিযান দ্বিতীয় অভিযানের তুলনায় অনেক বেশী সফল হয়েছিল। এই অভিযানেই তিনি ১৭০৯-এর ২রা ফেব্রুয়ারী জুয়ান ফারনানডেজ দ্বীপ থেকে আলেকজান্ডার সেল্‌কার্ককে উদ্ধার করেন। এই অভিযানে সংগৃহীত সম্পত্তি থেকে প্রায় দুলক্ষ পাউন্ড লাভ হয়। দীর্ঘ অভিযানের পর ড্যাম্পিয়ের লন্ডনে ফিরে আসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর প্রাপ্য অংশের অর্থ পাওয়ার আগেই ১৭১৫তে লন্ডন শহরেই ড্যাম্পিয়েরের মৃত্যু হয়।

মনে রাখা দরকার মূলত ভয়ঙ্কর জলদস্যু হয়েও ড্যাম্পিয়ের-এর সংগৃহীত সমুদ্র সংক্রান্ত নানা তথ্য পরবর্তী সময়ে সমুদ্র-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক উন্মোচনে প্রভূত সাহায্য করেছে। সমুদ্রের পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ পরবর্তী সময়ে চার্লস্ ডারউইন ও আলেকজান্ডার ভন্ হাম্‌বোল্ডকে তাদের মতবাদ বিকাশে প্রচুর সাহায্য করেছিল। নৌবাহবিজ্ঞান (Navigation) প্রযুক্তিতে তাঁর উদ্ভাবন জেমস্ কুক ও ব্রিটীশ এ্যাড্‌মিরাল তথা ট্রাফালগড় যুদ্ধ বিজয়ী নায়ক হ্যারাশিও নেলসন্‌কে (১৭৫৮-১৮০৫) ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ড্যানিয়েল ডেফোর (Daniel Defore) "রবীনসন্ ক্রোশো" রচনায় ড্যাম্পিয়েরের সঙ্গী আলেকজান্ডার সেলকার্কের নির্জন দ্বীপে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের প্রকৃত ঘটনার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। তাঁর রিপোর্ট থেকে পাওয়া দক্ষিণের মহাসাগর (Southern Ocean) বা অ্যানটার্কটিক মহাসাগরের (Antarctic Ocean) দ্বীপগুলিতে রুটি ফলের (Breadfruit) গাছের খবর পেয়ে উইলিয়াম ব্লিগ (William Bligh), এইচ্ এম্ এস্ বাউন্টিতে (H.M.S. Bounty) চেপে দক্ষিণের মহাসমুদ্র অভিযান শুরু করেছিলেন। ড্যাম্পিয়েরই প্রথম দেখেছিলেন যে ঐ সব গাছের রুটিফলগুলিকে সেঁকে নিলে রুটির বিকল্প খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

৪০টি বন্দুকে সুসজ্জিত জাহাজের জলদস্যু থেকে নতুন নতুন সমুদ্র পথের দিশারী, নতুন দ্বীপ ও প্রণালীর আবিষ্কারক, সমুদ্র পথে তিন-তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী ড্যাম্পিয়ের স্থলেও সমান বৈচিত্রপূর্ণ জীবনের পরিচয় রেখে গেছেন। এড্‌ওয়ার্ড স্প্রাগের (Edward Sprague) সহকর্মী হিসাবে তৃতীয় অ্যাংলো-ডাচ্ যুদ্ধে অংশে গ্রহণ ছাড়াও ১৬৭৩-এ মাত্র ২১ বছর বয়সে ড্যাম্পিয়ের স্কুনেভেল্ডের (Schooneveld) যুদ্ধ লড়েছিলেন। তারপরই ১৬৭৪-এ প্লানটেশন ম্যানেজারের চাকুরী নিয়ে জামাইকা চলে যান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার সমুদ্রের আহ্বানে সমুদ্র যাত্রার প্রয়াসী হন। ড্যাম্পিয়েরের সমুদ্র অভিযানের তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী পরবর্তী সমুদ্র বিজ্ঞানীদের কাজে প্রভূত প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর কাজের ব্যাপ্তি এতই বেশী ছিল যে অক্সর্ফোড ইংরাজি অভিধানে ড্যাম্পিয়েরের কর্মকান্ডের প্রসঙ্গ এক হাজারেরও বেশী বার উল্লিখিত হয়েছে।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ও তাঁর গাল্ফ স্ট্রিম্

১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ায় আমেরিকার পথিকৃৎ সমুদ্র অনুসন্ধানীদের মধ্যে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন (১৭০৬-১৭৯০) (Benjamin Franklin) অন্যতম। পদার্থ বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, লেখক, চিত্রশিল্পী ও অন্যান্য নানা বিষয়ের পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও বেঞ্জামিন জীবনের শেষ অধ্যায়ে সমুদ্র স্রোতের গতি-প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে আটলান্টিক মহাসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত 'গাল্ফ স্ট্রিম'-এর চরিত্র অনুধাবণ করে এর মানচিত্র তৈরি করেন। ইউরোপ থেকে আমেরিকায় যাত্রাপথে মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় বেঞ্জামিনের তৈরি সমুদ্র পথ নির্দেশিকা জলপথ অতিক্রম করার সময়ের ব্যাপ্তি ও সমুদ্র যাত্রার ব্যয়ও বহুলাংশে হ্রাস করতে সাহায্য করেছে।

বেঞ্জামিন ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান তথ্য অনুসন্ধানী। তাঁর সমুদ্র বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া পরবর্তী সময়ে ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞানের (Physical Oceanography) বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহে প্রভূত সাহায্য করেছে। সুদীর্ঘ জীবনকালে বেঞ্জামিন (সংক্ষেপে যিনি 'বেন' নামে পরিচিত ছিলেন) বেশ কয়েকটি সমুদ্র অভিযানে বেড়িয়েছিলেন। যাত্রাপথে থার্মোমিটার ব্যবহার করে তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের জলের উপরিতলের তাপ নির্ণয় ক'রে সমুদ্র স্রোতের বিভিন্ন অংশে তাপ ও তাপের তারতম্যের মানচিত্র তৈরি করেছিলেন।

পরিচ্ছেদ-৪

ক্যাপ্টেন জেমস্ কুক : দ্বীপমালা থেকে মহাদেশীয় উপকূলের মানচিত্রকার

জেমস্ কুক (চিত্র-২) (১৭২৮-১৭৭৯) (James Cook) ইংরেজ সমুদ্র অভিযাত্রী, ন্যাভিগেটর ও মানচিত্র অঙ্কনবিদ্। খুব ছোট বয়সে রয়াল নেভিতে যোগদান করে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। ১৭৬০-এর দশকে উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্বের দ্বীপ নিউফাউন্ডল্যান্ডের নিখুঁত মানচিত্র তৈরি করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন, কারণ নিউফাউন্ডল্যান্ডের সীমানা নির্ধারণ করা তৎকালীন সময়ে ছিল অত্যন্ত দুরূহ কাজ। মাত্র ৫১ বছরের জীবনে জেমস্ কুক তিন-তিনবার সমুদ্র অভিযানে বেরিয়ে আর্ক্‌টিক থেকে অ্যান্‌টার্কটিকা ও আলাস্কা থেকে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমুদ্র অঞ্চলের কোনও স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা নির্ণয় করা তখনকার সময়ে সহজ কাজ ছিলনা। কুকই প্রথম এই কাজে সফল হন। অ্যানটার্কটিক মহাসাগরের তুষারপাত প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। সুদূর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যান্ডের পূর্বে টাহিটি-সহ প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপে কুকই প্রথম পদার্পণ করেন। প্রবাল সমৃদ্ধ কুক দ্বীপ তাঁর নামেই চিহ্নিত হয়ে আছে।
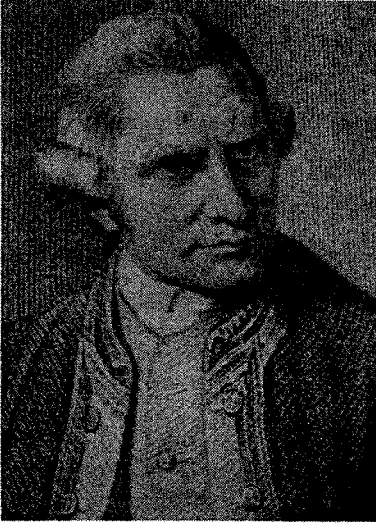
চিত্র-২: ক্যাপ্টেন জেমস্ কুক

অনেক দুর্গম স্থানে অভিযান চালিয়ে সেখানকার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও নিখুঁত জরিপের মাধ্যমে ঐসব অঞ্চলের নির্ভুল মানচিত্র তৈরি করতে কুক তাঁর পারদর্শীতার পরিচয় রেখে গেছেন। এইসব কাজ করতে রয়াল অ্যাডমিরালের আপত্তি সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিতেও কুক পিছু পা হননি। আর্কটিক বলয়ে ও অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের গ্রেট বেরিয়ার রিফ্-এর প্রকৃত তথ্য জানার জন্য বহুবার কুক সমুদ্র পৃষ্টের তলায় গিয়ে সেখানকার নমুনা সংগ্রহ করেছেন। সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মতভাবে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও জীবের সংগ্রহও আমরা পেয়েছি কুকের কাছেই। তিনিই প্রথম বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপের উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ করে এনে সর্বসমক্ষে তা উপস্থাপিত করেন।

পরিচ্ছেদ-৪

কুকের প্রথম মহাসমুদ্র পরিক্রমা ১৭৬৮ থেকে ১৭৭১ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়। ১৭৬৮তে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণদিকের শেষ প্রান্তের কেপ্ হর্ণ (Cape Horn) ঘুরে ১৭৬৯-এর ১৩ই এপ্রিল প্রশান্ত মহাসাগরের টাহিটি দ্বীপে পৌঁছান। পরিক্রমায় নিউজিল্যান্ডের সমগ্র উপকূল পর্যবেক্ষণ করে নিউজিল্যান্ডের উপকূলীয় মানচিত্র তৈরি করেন। এরপর আরো পশ্চিমে যাত্রা করে ১৯শে এপ্রিল ১৭৭০ অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল পার হওয়ার সময় গ্রেট বেরিয়ার রিফে (Great Barrier Reef) তাঁর জাহাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই সময় কুক অস্ট্রেলিয়ার নিউসাউথ ওয়েলস্ আবিষ্কার করেন। মেরামতের পর ঐ জাহাজ নিয়ে টোরেস প্রণালীর (Torres Strait) মধ্যে দিয়ে ২২শে অগাষ্ট ১৭৭০-এ পজেসন্ দ্বীপে (Possession Island) পৌঁছান। অভিযান শেষে গুড্ হোপ অন্তরীপ (Cape of Good Hope) ও সেন্ট্ হেলেন (Saint Helen) হয়ে ১৭৭১-এর ১২ই জুলাই ইংল্যান্ড ফিরে আসেন।

কুকের দ্বিতীয় সমুদ্র অভিযানে (১৭৭২-৭৫) তিনি অত্যন্ত উঁচু অক্ষাংশ ধরে পৃথিবী পরিক্রমার পরিকল্পনা করেন। এইচ্ এম্ এস্ রেসোলিউশন (HMS Resolution) নামের জাহাজে চেপে ১৭৭৩-এর ১৭ই মে কুকই প্রথম, সুমেরু বৃত্ত (Arctic Circle) অতিক্রম করেছিলেন। যাত্রাপথে ক্লার্ক রকস্ (Clerke Rocks) ও দক্ষিণ স্যানডুইচ দ্বীপ মালার (South Sandwich Islands) আবিষ্কার ও নামকরণ করে ১৭৭৪-এর ৩১শে জানুয়ারী কুক ৭১°১০' দক্ষিণ অক্ষাংশের অ্যানটার্কটিকায় পৌঁছান। সেখান থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কুক ফ্রেন্ডলি দ্বীপ (Friendly Island), ইস্টার দ্বীপ (Easter Island), নরফোক্ দ্বীপ (Norfolk Island), নিউ ক্যালিডোনিয়া (New Caledonia) প্রমুখ প্রশান্ত মহাসাগরের প্রত্যন্ত দ্বীপগুলিতে কিছু সময়ের জন্য অবতরণ করেন। তাঁর বিশাল অভিযানে অভিভূত হয়ে ইংল্যান্ডের 'হাউস অফ লর্ডস্' কুককে 'First Navigator of Europe' সম্মানে ভূষিত করে বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিল।

কুকের তৃতীয় সমুদ্র অভিযান চলে ১৭৭৬-৭৯সাল পর্যন্ত। এবারও তাঁর সমুদ্র যাত্রার সঙ্গী জাহাজ সেই এইচ্ এম্ এস্ রেসোলিউশন। এই অভিযানে কুকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সুমেরু বৃত্তের 'Northwest Passage' আবিষ্কার করা। ১৭৭৮-এ কুক আলাস্কার উপকূলে পৌঁছান ও প্রথম ইউরোপীয় হিসাবে হাওয়াই দ্বীপে পৌঁছনোর কৃতিত্ব অর্জন করেন। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব দিক ধরে চলতে চলতে কুক আমেরিকার পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাতে থাকেন ও পরে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল থেকে উত্তর আমেরিকার উত্তর পশ্চিম প্রান্তের বেরিং প্রণালী পর্যন্ত সুদীর্ঘ জটিল অঞ্চলের এক অনবদ্য মানচিত্র তৈরি করেন। তাঁর আবিষ্কারের মধ্যে আছে অলাস্কার একটি খাড়ি (Intel) যা আজ 'কুক খাড়ি' (Cook Inlet) নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। তাঁর এই তৃতীয় সমুদ্র অভিযানে কুক আলাস্কার নির্ভুল দৈর্ঘ্যও নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৭৭৮-এই কুক হাওয়াই দ্বীপে ফিরে আসেন। ১৭৭৯-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী হাওয়াই দ্বীপের কীলাকেকুয়া (Kealakekua) উপসাগরে আদিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে কুক নিহত হন। তাঁর মৃত্যুতে তৎকালীন সমুদ্র অভিযানে কিছু দিনের জন্য ছেদ পরে যায়।

আলেকজান্ডার ভন্ হাম্‌বোল্ট্ ও পেরু স্রোত

জেমস্ কুক ও বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের প্রায় সমসাময়িক কালে জার্মান প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও ভূ-তাত্ত্বিক আলেকজান্ডার ভন্ হাম্‌বোল্ট (চিত্র-৩) (১৭৬৯-১৮৫৯) (Alexander Von Humboldt) মহাসাগরের অনন্ত রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৭৯৯-১৮০৪ সালে তাঁর অর্থানুকূল্যে দক্ষিণ আমেরিকা অভিযান সম্পন্ন হয়। এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বিষয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা। ঐ অভিযানে হামবোল্ট দক্ষিণ আমেরিকার জীব বৈচিত্রের বিষয়ে নানান তথ্য ছাড়াও ঐ মহাদেশের মাটি-পাথর, জলবায়ু ও ভূকম্পন সংক্রান্ত বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের পেরু অঞ্চলের শীতল, কুয়াশাঘন প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য পেরুর উপকূলীয় স্রোতই যে দায়ী হাম্‌বোল্ট তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিই প্রথম দেখালেন যে পেরুর শীতলতার জন্য প্রকৃতপক্ষে ঐ উপকূলীয় জলের উচ্ছ্বাস (Upwelling) বা শীতল উপকূলীয় স্রোতের উপরে উঠে আসার প্রক্রিয়া জড়িত। হাম্‌বোল্টের এই আবিষ্কারের জন্য পেরুর দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত উপকূলীয় স্রোতের নাম 'হামবোল্ট স্রোত' যা বর্তমানে পেরু স্রোত নামে পরিচিত।
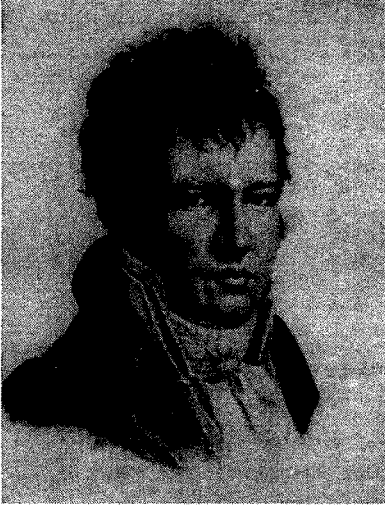
চিত্র-৩: আলেকজান্ডার ভন্ হাম্‌বোল্ট

আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করার সময় হাম্‌বোল্ট লক্ষ্য করেছিলেন যে এই মহাসাগরের সীমানায় অবস্থিত মহাদেশগুলি, বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা নিশ্চয়ই এক সময় যুক্ত ছিল, কারণ এদের সীমানার চেহারায় এদের কোনও এক সময়ে সংযুক্তির সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান। হাম্‌বোল্টের এই পর্যবেক্ষণ পরবর্তী সময়ে সত্যে পরিণত হয়েছিল। তাই দেখা যায় যে গন্ডোয়ানাল্যান্ডের অস্তিত্বের প্রথম বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তাও হাম্‌বোল্টের মস্তিষ্কপ্রসূত। জোসেফ্ লুইস্ গেলুসাক্ থেকে জাস্টাস্ ভন্ লেবিগ্, লুইস আগাসিজ, এম্ এফ্ মাউরি ও এইমি রনপ্ল্যান্ড পর্যন্ত বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীদের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণের সত্যাসত্য যাচাই করে নিতেন। ১৮৪৫-এ প্রকাশিত কস্‌মস (Kosmos) নামে পাঁচ খন্ড গ্রন্থে হাম্‌বোল্টের বিজ্ঞান সাধানার ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ল্যাটিন আমেরিকা অভিযানই প্রকৃতপক্ষে ভৌত-ভূবিজ্ঞান (Physical Geography) ও আবহবিদ্যার (Meteorology) ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

পরিচ্ছেদ-৪

পৃথিবী ব্যাপী সমতাপ রেখাগুলিকে (Isothermal lines) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে হামবোল্ট বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর তুলনা করার নতুন পন্থা আবিষ্কার করেন। ১৮০৪-এর ৭ই ডিসেম্বর হাম্‌বোল্ট প্যারিস্‌ ইন্‌স্টিটিউটে তাঁর আরও এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের বিষয়ে বক্তৃতা করেন যেখানে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি, দুটি মেরু থেকে বিষুব রেখার দিকে ক্রমশ কমে আসে। আমেরিকার আগ্নেয়গিরিগুলিকে পরীক্ষা করে তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন যে এরা কতগুলি নির্দ্দিষ্ট বলয় বা রেখা বরাবর অবস্থান করে ও সম্ভবত ভূত্বকের নিচে তৈরি হওয়া বিশাল ফাটল থেকে উদ্গিরীত হয়। আগ্নেয় শিলার জন্ম ম্যাগমা থেকে এই বিষয়টি প্রমাণ করার সুবাদে তিনি প্রাথমিক শিলার (Primary rocks) সৃষ্টির সপক্ষে ম্যাগ্‌মাটিসম্‌ (Magmatism) তত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন ও পুরোনো ভ্রান্ত নেপচুনিসম্‌ (Neptunism) ধারণটিকে নস্যাৎ করেন। নেপচুনিসম্‌-এ বলা হয়েছিল সমস্ত রকম শিলার সৃষ্টি মহাসমুদ্রের জল থেকে।

এইসব যুগান্তকারী কাজ ছাড়াও স্প্যানিশ উপনিবেশ অধ্যুষিত কিউবার উপর তাঁর বৈজ্ঞানিক ও সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার জন্য হাম্‌বোল্টকে কিউবার দ্বিতীয় আবিষ্কারক বলা হয়েছে। তাঁর আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়া উপসাগরের নামাকরণ হয়েছিল হাম্‌বোল্ট উপসাগর (Humboldt Bay)। প্রায় ৪০,০০০ মাইল সমুদ্র অভিযানের মধ্যে দিয়ে আমেরিকা ও ইউরোপের উপর সংগৃহীত সমস্ত তথ্য হাম্‌বোল্ট ৩০টি বৃহৎ গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন।

১৮৫৭-র ২৪শে ফেব্রুয়ারী হাম্‌বোল্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এরপর অসুস্থ অবস্থায় ১৮৫৯-এর ৬ই মে ৮৯ বছর বয়সে বার্লিণে তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর মৃত্যুর পর চার্লস্‌ ডারউইন বলেছিলেন যে হামবোল্ড ছিলেন তৎকালীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পবিব্রাজক বিজ্ঞানী যিনি ছিলেন তাঁর কাছে প্রশাংসার উর্দ্ধে পূজনীয় এক ব্যক্তিত্ব।

পরিচ্ছেদ-৫

জেমস্ হাটন্ ও তাঁর সমতাবাদ

বর্তমান সময়ের বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ঘটনা ও তাদের সংঘটিত হওয়ার জন্য সক্রিয় প্রক্রিয়াগুলি, প্রাচীন ভূতাত্ত্বিক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হওয়ার প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারণের সঙ্গে অভিন্ন। অর্থাৎ কোটি কোটি বছরের ব্যবধান থাকলেও ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলি একই নিয়মে সংঘটিত হয়। সংক্ষেপে একেই বলা হয়েছে 'ইউনিফরমিটারিয়ানিজম্' (uniformitarianism) বা সমতাবাদ যার অর্থ বর্তমান সময়ের দৃশ্যমান ঘটনাসমূহই অতীত ইতিহাসের দরজার চাবি বা Present is the key to the past। ১৭৮৫-তে এই অসাধারণ তাত্ত্বিক কথার প্রবক্তা স্কটিশ প্রকৃতি ও ভূবিজ্ঞনী জেমন্ হাটন্ (চিত্র-৪) (১৭২৬-১৭৯৭) (James Hutton)। প্রচলিত বহু অবৈজ্ঞানীক চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটিয়ে আধুনিক ভূ-বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হাটন্ ভূবিজ্ঞানের বহু বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছিলেন। ১৭৮৫-র ৪ঠা জুলাই Royal Society of Edinburgh-এ তাঁর লিখিত প্রবন্ধ The System of the Earth, its Duration and Stability পঠিত হওয়ার পর বিজ্ঞানী মহলে আলোরণের সৃষ্টি করে। স্তরবিদ্যায় (stratigraphy) স্তরক্রমের মধ্যে অননুক্রম বা unconformity-র অস্তিত্বও হাটন্ই প্রথম আবিষ্কার করেন।

চিত্র-৪: জেমস্ হাটন

১৭৯৫-এ তাঁর লেখা "The Theory of the Earth" দিয়েই সামুদ্রিক ভূবিদ্যার সূচনা হয়। হাটন্ বিশ্বাস করতেন সময়ের সঙ্গে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলি নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক স্থান পরিবর্তন করে। বর্তমান সময়ের 'মহাদেশীয় সঞ্চরণ' ও 'প্লেট টেক্টনিকস্' তত্ত্ব যা প্রমাণ করেছে। ফলে কোনও একসময়ের মহাসাগরীয় অঞ্চল মহাদেশীয় অঞ্চলে ও মহাদেশীয় অঞ্চল মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এই চিন্তার বশবর্তী হয়েই হাটন পৃথিবীর স্থলভাগে বিচরণ করেই সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানের তথ্য অনুসন্ধানে সক্রিয় হয়েছিলেন।

হাটন্ লক্ষ্য করেছিলেন সমুদ্রতল ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে কখনও সমুদ্রতটকে নিমর্জিত

করে আবার কখনও গভীর সমুদ্র অঞ্চলকে সমুদ্রতট হিসাবে উন্নীত করে দেয়। হাটন্ এই বিষয়টিকে সমুদ্রের আগ্রাসন (transgression) ও সমুদ্রের প্রত্যাবর্তন (regression) হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সমুদ্রতটের উপকূলীয় জলে আবৃত ও অনাবৃত হওয়ার ঘটনা ছাড়াও হাটনের বিশ্বাস ছিল যে গভীর সমুদ্রের শিলাসমূহকে মহাদেশের অভ্যন্তরে পাওয়া সম্ভব। তাঁর "The Theory of the Earth"-এ তিনি এ বিষয়ে আলোকপাত করার পর অনুজ ভূবিজ্ঞানীদের মহাসমুদ্রের তলদেশের ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলী জানার উৎসাহ বেড়ে যায়।

হাটনের "The Theory of the Earth" প্রকাশের কয়েক বছর আগেই প্রখ্যাত রসায়ণবিদ্ এ. এল. লাভোইসের (১৭৪৩-৯৪) (A.L. Lavoiser) দু ধরণের সামুদ্রিক পললের স্তর চিনতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে সমস্ত পলল উন্মুক্ত সমুদ্রের অনেক গভীরে জমা হয় তাদের তিনি নাম দেন 'দূরসামুদ্র' বা pelagic আর যে সমস্ত সামদ্রিক পলল তটভূমি বা সন্নিহিত স্বল্পগভীর উপকূলীয় অঞ্চলে অবক্ষেপিত হয় তাদের 'উপকূলীয়' বা littoral নামে অভিহিত করেন। অবস্থানগত তফাতের জন্য দূরসামুদ্র পললের অবক্ষেপ হয় সমুদ্রের শান্ত, গভীর পরিবেশে আর উপকূলীয় পললের অবক্ষেপ হয় অগভীর জোয়ার-ভাটা ও উপকূলীয় তরঙ্গ-সমৃদ্ধ অশান্ত পরিবেশে।

হাটন্ তাঁর সমতাবাদ তত্বকে জীবজগতের বিবর্তনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। 'প্রাকৃতিক পছন্দের' উপর নির্ভর করে যে প্রাণীকূলের বিবর্তন সম্ভব এ বিষয়েও হাটন্ বিশ্বাসী ছিলেন। শিলার স্তরক্রমের অর্ন্তবর্তী অননুক্রমের উপর গবেষণা করতে গিয়ে হাটন্ পরস্পর সন্নিবিষ্ট দুই রকমের শিলার আপেক্ষিক বয়স নির্ধারণ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

জোহানস্ ওয়ালদার ও তাঁর পাললিক শিলার স্তরক্রম তত্ত্ব

১৮৯৩-এ জার্মান ভূবিজ্ঞানী জোহানস্ ওয়ালদার (চিত্র-৫) (Johannes Walther) সর্বপ্রথম হাটনের 'ইউনিফরমিটারিয়ানিজম্'' বা সমতাবাদ সূত্রকে ব্যবহার করে নতুন পলির সঞ্চয়ন পদ্ধতির প্রক্রিয়াকে প্রাচীন পাললিক শিলার সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রয়োগ করেন। ওয়ালদারের তত্ব বা সূত্রের (Walther Law) মুখ্য বিষয় হলো আধুনিক সময়ে পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পললস্তরের পার্শ্বিক বন্টনের (lateral distribution) সঙ্গে উল্লম্বভাবে সজ্জিত (vertically distributed) পাললিক শিলার পর্যায়ক্রমের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা। তাঁর এই নিয়মকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান সময়ের বিজ্ঞানীরা

চিত্র-৫: জোহানস্ ওয়ালদার

স্তরীভূত পাললিক শিলার ক্রমবিন্যাসের সঙ্গে ঐ সব শিলার সঙ্গে জড়িত অতীত পাললিক পরিবেশের (sedimentary facies) যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন।

সমুদ্র পৃষ্ঠের ওঠা-নামার সঙ্গে সৈকততটে সমুদ্রের স্থলাভিমুখী আগ্রাসন (transgression) ও স্থল থেকে সমুদ্রাভিমুখী অপসরণ (regression)-এর ঘটনা ঘটে। ওয়ালদারের সুত্রকে কাজে লাগিয়ে জি.এস. ভিসার (G.S. Visher) ১৯৬৫-তে দেখালেন যে সমুদ্রের আগ্রাসনের সময় সমুদ্রতটের সবচেয়ে দূরে অবস্থিত বালিয়াড়ির অবক্ষেপ সৈকতের অবক্ষেপ দ্বারা, সৈকতের অবক্ষেপ নিকটবর্তী তটের অবক্ষেপ দ্বারা ও নিকটবর্তী তটের অবক্ষেপ মহীসোপানের অবক্ষেপ দ্বারা নিচ থেকে উপরের দিকে একটি উল্লম্ব স্তরক্রমের সৃষ্টি করে। সমুদ্র পশ্চৎগামী হলে এই স্তরক্রম সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে সজ্জিত হয় যেখানে সমুদ্র তটের বালিয়াড়ির অবক্ষেপ সবার উপরের স্তর গঠন করে ও মহীসোপানের স্তর চলে যায় সবার নিচে (চিত্র-৬)।

ওয়ালদারের এই কাজ সামুদ্রিক ভূবিদ্যা ছাড়াও সামগ্রিক ভাবে ভূবিদ্যাকে একটি শক্ত ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৮৯৩-এ তাঁর গ্রন্থ 'Bionomie des Maeres'-এ তিনি সামুদ্রিক পরিবেশ, সামুদ্রিক জীবের প্রতিবেশ, খোলস তৈরিকারী সামুদ্রিক জীব ও তাদের দ্বারা তৈরি সামুদ্রিক পলি অবক্ষেপের এক সামগ্রিক বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

এর প্রায় চার দশক পর ১৯৩৯-এ অগভীর থেকে গভীর সমুদ্রে পলি সঞ্চয়নের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছিল পি.ডি. ট্রাস্কের (P.D. Trask) সম্পাদনায় 'Recent Marine Sediment' গ্রন্থে যা ছিল তৎকালীন প্রখ্যাত সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানীদের গবেষণা মূলক নানা রচনায় সমৃদ্ধ।
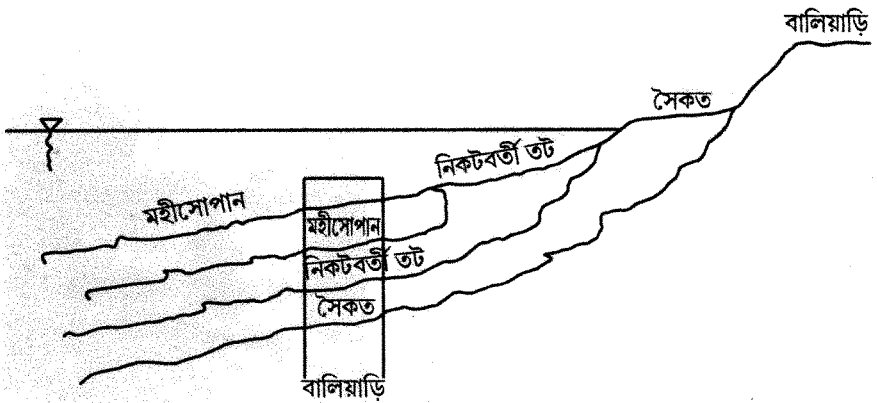
(ক) সমুদ্রের আগ্রাসন ও উপকূলীয় স্তরক্রম
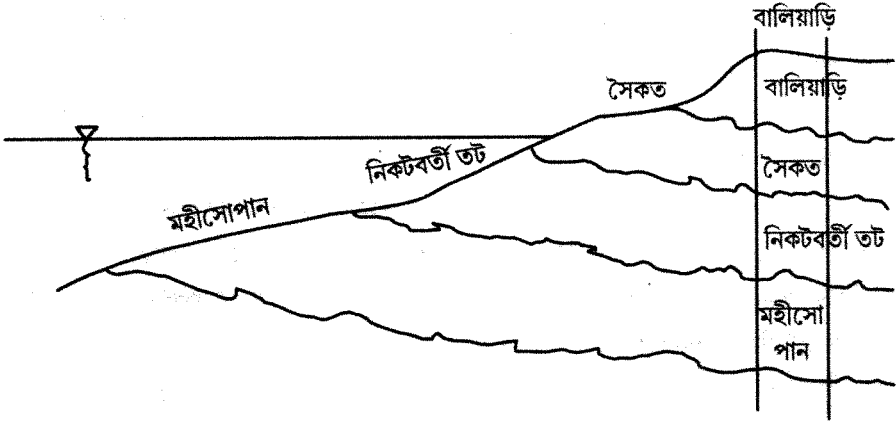
(খ) সমুদ্রের অপসরণ ও উপকূলীয় স্তরক্রম

চিত্র-৬ ওয়ালদারের নিয়ম অনুযায়ী জি.এস. ভিসারের তৈরি মডেলে সমুদ্রের আগ্রাসন ও অপসরণের সঙ্গে উল্লম্বভাবে সজ্জিত স্তরক্রম দেখান হয়েছে (চিত্র আর.এ. ডেভিস, ১৯৮৩ অনুসারে)

মহাসাগরের গভীরতা ও জেমস্ রসের কুমেরু অভিযান

মহাসাগরের তলদেশকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) মহাদেশের কিনারা (Continental Margin) যার মধ্যে মহাদেশের দিক থেকে প্রথমে আছে মহীসোপন, তারপর মহীঢাল ও সব শেষে মহীউত্থান—যারা মহাসাগরের তলদেশের মাত্র ২১-২৫ শতাংশ অঞ্চল অধিকার করে আছে। আর মহাসমুদ্রের বাকী অংশ গভীর সমুদ্র অঞ্চল বা (Deep ocean basin। উচ্চতা ও গভীরতার বিচারে পৃথিবী পৃষ্ঠকে প্রধাণত দুটি তলে (level) ভাগ করা যায়। একটি মহাদেশীয় গড় সমতল যা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে মাত্র ০.৮ কিমি উঁচু আর একটি মহাসাগরীয় গড় গভীরতার সমতল যা গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৩.৮ কিমি গভীরে। সুতরাং সমুদ্র তলের গড় গভীরতা থেকে মহাদেশগুলির গড় উচ্চতা ৪.৬ কিমি। মহাসাগরগুলির মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতা ৩.৯৪ কিমি, আটলান্টিকের গড় গভীরতা ৩.৫৭ কিমি ও ভারত মহাসাগরের গড় গভীরতা ৩.৮৪ কিমি। গড় গভীরতা এই রকম হলেও বহু ক্ষেত্রেই সমুদ্রের গভীরতা ৫-৬ কিমি বা তারও বেশী। এছাড়া আছে মহাসাগরীয় ভূখাত (Oceanic trench) অঞ্চল যে সব অঞ্চলে সমুদ্রের গভীরতা ৭.৫ কিমি (ভারত মহাসাগরের জাভা খাত) থেকে ১১.৫ কিমি এরও বেশী (পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের মিনদানাও) হতে পারে।

মহাসাগরের গভীরতা মাপার প্রচেষ্টা চলছে শতাব্দী ধরে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৮৪০-এ স্যার জেমস্ রস (Sir James Ross) এইচ্ এম্ এস্ ফ্রেবাস এ্যান্ড টেরর (H.M.S. Frebus and Terror) নামের জাহাজে অ্যানটার্কটিক্ অভিযানের নেতৃত্ব দেন। দক্ষিণের মহাসাগরের কোন একটি স্থানে রস্ ৪৪৩৫ মিটার গভীরতাও নির্ণয় করেন। এর ফলে সমুদ্রের

গভীরতা সম্বন্ধে তাঁর একটি ধারণা জন্মায়। তারই নাম অনুসারে অ্যানটার্কটিকার নিকটবর্তী একটি সাগরের নামাকরণ করা হয় রস্ সি (Ross Sea)। পৃথিবীর উত্তর চৌম্বকীয় মেরু যেমন উত্তর-পশ্চিম গ্রীনল্যান্ডের নিকটে তেমনি দক্ষিণ চৌম্বকীয় মেরু ও উত্তর চৌম্বকীয় মেরুর ঠিক বিপরীতে অ্যানটার্কটিকার পার্শ্ববর্তী রস সি-র খুব কাছে।

এর ঠিক পরেই উত্তর আমেরিকার উপকূল ও ভূমিতি সমীক্ষক দল (US Coast and Geodetic Survey) ১৮৪৩-এ উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের মহীসোপানের ৩০,০০০ বর্গ কিমি অঞ্চলের গভীরতার চার্ট তৈরি করে। সমুদ্রের গভীরতা নিরূপনে তখন ইকো সাউন্ডার (Echo Sounder) ব্যবহৃত হতো।

এর ঠিক দু-দশক পরে ১৮৬৬তে আমেরিকার নৌ-সেনা অফিসার এম্ এফ্ মাউরি (M.F. Moury) নৌ-সেনা জাহাজ ব্যবহার করে আটলান্টিক মহাসাগরের এক বিরাট অঞ্চলের গভীরতার মানচিত্র তৈরি করেন। ঐ মানচিত্রে মাউরি সমুদ্রতলের গভীরতার মধ্যে ছোট-খাট তারতম্যও অত্যন্ত নিপুনভাবে তুলে ধরেন।

পরিচ্ছেদ-৬

এম এফ্ মাউরি : সমুদ্র পথ প্রদর্শক

ম্যাথিউ ফন্টেইন মাউরি (চিত্র-৭) (১৮০৬-১৮৭৩) (Mathew Fontaine Maury) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। আমেরিকার ভার্জিনিয়ায় ১৪ই জানুয়ারী ১৮০৬ তাঁর জন্ম। তিনি একাধারে জ্যোর্তিবিজ্ঞানী, জ্যোর্তিপদার্থ বিজ্ঞানী, আবহাওয়াবিদ্, ভূতাত্ত্বিক, সমুদ্রাবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদ্ ও লেখক। সমুদ্র-পথ প্রদর্শক (Pathfinder of the sea) নামে সমধীক পরিচিত মাউরিকে আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞান ও সামুদ্রিক আবহাওয়া-বিদ্যার জনক বলা হয়েছে। ১৮৫৫-তে প্রকাশিত তাঁর "ফিসিক্যাল জিওগ্রাফি অফ্ দি সিস্" (Physical Geography of the Seas) তৎকালীন সময়ে সমুদ্রবিজ্ঞানের বিষয়ে লেখা সবচেয়ে বৃহৎ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। সমুদ্র বায়ু, সমুদ্র স্রোত ও সংক্ষিপ্ত পথে সমুদ্রে চলাচলের পথ নির্দেশিকা হিসাবে তাঁর তৈরি চার্ট বা মানচিত্রগুলি সমুদ্র অভিযাত্রী নাবিকদের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।
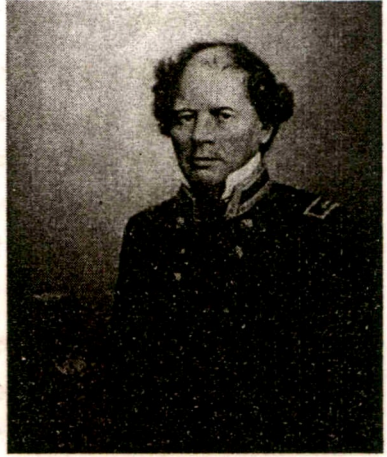
চিত্র-৭: ম্যাথিউ ফন্টেইন মাউরি

১৮২৫শে মাত্র ১৯ বছর বয়সে আমেরিকার রণতরী ব্রান্ডিওয়াইন্-এ (Brandywine) কর্মচারী হিসাবে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাউরি সমুদ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমুদ্র বিষয়ে পড়াশুনার সাথেই সমুদ্রে ন্যাভিগেশন প্রক্রিয়ার তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। কিন্তু মাত্র ৩৩ বছর বয়সে একটি ডাকগাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর কোমড় ও হাঁটু ভেঙে যায়। ফলে তার সমুদ্র অভিযানে ছেদ পরে। সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাউরি আবার সামুদ্রিক আবহাওয়া, ন্যাভিগেশন, সমুদ্রবায়ু ও সমুদ্র স্রোত বিষয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করেন ও পরে ১৮৪২ শে United States Naval Observatory তে সুপারিন্টেনডেন্টের পদে চাকুরী গ্রহণ করেন। ঐ পদ থেকে ১৮৬১তে পদত্যাগ করা পর্যন্ত মাউরি অবসারভেটরির অন্যান্য কাজের সঙ্গে U.S. Navy-র পত্তনের সময় থেকে বিভিন্ন জাহাজের নাবিকদের বিভিন্ন সমুদ্র পথের গতিমান লেখা বই বা লগ্‌বুক পরীক্ষা করে সমুদ্র স্রোত ও সমুদ্রবায়ুর বহু তথ্য উদ্ধার করেন, যার ফলে সমুদ্রে চলার সময় জাহাজের প্রতিকূল সমুদ্রবায়ু ও অনুবাহ স্রোতের

(drift current) গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য তাঁর হাতে আসে। সেইসব তথ্য থেকে মাউরি বিভিন্ন সমুদ্রে বিভিন্ন ঋতুতে সমুদ্র বায়ুর গতিবিধি, বিভিন্ন সমুদ্রের উত্তাল ও শান্ত অবস্থার কাল ও সমুদ্র স্রোতের গতিবেগের তারতম্য বিষয়ক মানচিত্র তৈরি করেন। এই সব মানচিত্রগুলি পরবর্তী সময়ে জাহাজের ক্যাপ্টেনদের সমুদ্র পথে চলার নির্দেশিকা হিসাবে প্রভূত সাহায্য করেছে। ঐ সব পুরোনো লগবুক থেকেই মহাসাগরগুলিতে তিমির প্রব্রজন (mingration) পথের নকশাও তৈরি করেন। তিমি শিকারীরা বছরের পর বছর সময় মহাসাগরে অতিবাহিত করেও জানতো না যে তিমিরা এক মহাসাগর থেকে অন্য মহাসাগরে দীর্ঘ চলাফেরার পথে সঙ্গীহীন অবস্থায় থাকে না। মাউরির তৈরি তিমি প্রব্রজন পথের নকশা তিমি শিকারীদের তিমির চলাফেরার পথের সন্ধান দিয়েছিল।

সমুদ্র স্রোতের উপর তাঁর গবেষণা থেকে মাউরি মহাসমুদ্রে উত্তর-পশ্চিম পথ বা Northwest Passage তত্ত্ব তৈরি করেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে উত্তর মেরুর নিকটবর্তী সমুদ্র অঞ্চলের একটি বিশেষ স্থান সময়ে সময়ে বরফ শূন্য থাকে। তিমিরা যেহেতু স্তন্যপায়ী জীব তাই তাদের শ্বাস নেওয়ার জন্য উত্তর মেরু অভিমুখী বরফশূন্য 'উত্তর-পশ্চিমমুখী পথের' অস্তিত্বও নিশ্চয়ই বিদ্যামান। মাউরির এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে পরবর্তী অভিযাত্রীরা নৌবাহযোগ্য এই সমুদ্র পথ সন্ধানের চেষ্টা চালিয়ে সফল হয়েছিলেন।

১৮৬৬ তে নৌসেনা জাহাজ ব্যবহার করে মাউরিই সর্বপ্রথম আটলান্টিক মহাসাগরের ৫২ ডিগ্রী উত্তর থেকে ১০ ডিগ্রী দক্ষিণ পর্যন্ত অক্ষাংশের গভীরতা ও তার তারতম্যের নিখুঁত মানচিত্র তৈরি করেন। সমুদ্র তলের গভীরতা নির্ণায়ক তাঁর এই মানচিত্র সমুদ্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মাউরির প্রকাশিত উত্তর আটলান্টিকের সমুদ্রবায়ু ও সমুদ্র স্রোতের চার্ট (Wind and Current chart of the North Atlantic) বহু নাবিককে সমুদ্র স্রোত ও সমুদ্রবায়ুকে নিজেদের সুবিধা মত কাজে লাগাতে সাহায্য করেছে। তাঁর "Sailing Directions" ও "Physical Geography of the Seas and its Meteorology" আদর্শ পুস্তক হিসাবে গণ্য হওয়া ছাড়াও পৃথিবীব্যাপী নৌসেনা ও বাণিজ্যিক বহরগুলিকে লাভজনক সংক্ষিপ্ত, সমুদ্র পথের নিশানা জুগিয়েছে।

বহু সম্মানে ভূষিত মাউরির নামে বহু সমুদ্রগামী জাহাজের নামাকরণ হয়েছে। যুক্ত রাষ্ট্রের নৌসেনা জাহাজ "US Maury", "USN Comodore Maury" নামের জাহাজগুলি তাঁরই নামের স্মারক। পরে সামুদ্রিক গবেষণার জন্য ও ভার্জিনিয়ার সমুদ্র বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য গবেষণা জাহাজ "R/V Mathew F. Maury"-র সৃষ্টি হয়। শিক্ষাবিদ্ হিসাবে মাউরি তাঁর গবেষণা লব্ধ বিভিন্ন বিষয়কে সমগ্র আমেরিকায় প্রচার করেন। বিভিন্ন স্থান ঘুরে বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি যখন ভীষণ ক্লান্ত সেই সময় ১৮৭৩-এর ১লা ফেব্রুয়ারী আমেরিকার লেক্সিনটন্ শহরে নিজের বাড়িতে মধ্যরাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগে শূন্যে হাত তুলে মাউরির শেষ কথা ছিল "All's Well"।

সমুদ্র ত্বকের উল্লম্ফন ও ওফিওলাইট পর্যায়ক্রম

ভূসমান্তরাল অনুবাহ (horizontal drift) ছাড়াও উল্লম্ফন হেতু (upliftment) মহাসাগরীয় ত্বক সমুদ্র-পৃষ্ঠের নীচে চলে যেতে বা উপরে উঠে আসতে পারে। এই সব উল্লম্ফন, উল্লম্ব (vertical) বা তীর্থক (inclined) যে কোন দিকেই হওয়া সম্ভব। ১৮৬০ সালে চার্লস ডারউইনের বিশিষ্ট বন্ধু বিজ্ঞানী টমাস্ হাকস্লে (Thomas Huxley) বিভিন্ন রকম টেক্‌টনিক্ কারণে মহাসাগরীয় ত্বকের উন্নীত হওয়ার বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন। হাকস্লেই প্রথম দেখালেন যে কোন কোন মহাদেশের অর্ন্তভূক্ত খড়ি জাতীয় চুনা পাথরগুলি (chalk) প্রকৃত পক্ষে সমুদ্র তল থেকে উঠে আসা প্লাঙ্কটন (plankton) জাতীয় প্রাণীদের দেহাবশেষ দিয়ে তৈরি পাললিক শিলা। সমুদ্রের গভীরে এই জাতীয় চুনাপাথরগুলির সৃষ্টি হলেও মহাদেশের অভ্যন্তরে সমুদ্র ত্বকের উল্লম্ফন হেতু মহাদেশীয় অঞ্চলেও এদের যথেষ্ট পরিমানে পাওয়া যায়।

এছাড়া পৃথিবীর বহু মহাদেশীয় অঞ্চলে বিশেষত দুটি মহাদেশের সংঘর্ষ (collision) জাত পার্বত্য অঞ্চলে মহাসাগরীয় ত্বকের তিনটি প্রধান স্তর সমেত upper mantle-র শিলাসমূহকে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। মহাদেশীয় অঞ্চলে এই ধরণের শিলাস্তরের পর্যায়ক্রম (sequence) গুলিকে ওফিওলাইট পর্যায়ক্রম (ophiolite sequence) বলে। এইসব শিলাস্তরের পর্যায়ক্রমগুলিতে শিলার গ্রথন (texture) ও রং দেখতে অনেকটা সাপের চামড়ার মত। তাই এদের নাম ওফিওলাইট বা সাপ-পাথর (snake rock)। প্রশ্ন হচ্ছে কী আছে এইসব সাপ-পাথরের স্তরগুলিতে? পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই পর্যায়ক্রমের সব চেয়ে উপরের স্তর পলল (sediment) দিয়ে তৈরি যা মহাসাগরীয় ত্বকের এক নম্বর স্তর (layer-1)-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। এর নিচের স্তরটিতে আছে ক্ষারীয় উদ্‌গারী শিলা (basic volcanic rock) যারা প্রায়শই পিলো লাভা (pillow lava) আকৃতির ও ক্ষারীয় ডাইক-এর (basic dyke) সমন্বয়। ওফিওলাইট পর্যায়ক্রমের এই দ্বিতীয় স্তরটি মহাসাগরীয় ত্বকের দ্বিতীয় স্তরের (layer-2) সঙ্গে ভীষণভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তৃতীয় বা সর্বনিম্ন স্তরটি গ্যাব্রো (gabbro), পাইরক্সিনাইট্ (pyroxenite) ও পেরিডোটাইট (peridotite) জাতীয় ক্ষারীয় ও অতি-ক্ষারীয় শিলার সমন্বয় যারা মহাসাগরীয় ত্বকের তৃতীয় স্তর (layer-3) ও ম্যান্টেলের শিলার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ (চিত্র-৮)।

১৯৭৬-এ বিজ্ঞানী জে.এফ্ ডিওয়ে-ই (J.F. Dewey) প্রথম সংঘর্ষ জাত পার্বত্য অঞ্চলে এই ধরণের ওফিওলাইট শিলার পর্যায়ক্রম দেখে ধারণা করেছিলেন যে ঐ সব অঞ্চলে গভীর মহাসাগরীয় ত্বক চ্যুতির (fault) মাধ্যমে উপরে উঠে এসে মহাদেশের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। মহাসাগরীয় ত্বকের এই ধরণের উঠে আসা বা উল্লম্ফনকে ডিওয়ে নাম দিয়েছিলেন অব্‌ডাক্‌শন (obduction), চরিত্রে যা সমুদ্র ত্বকের অধোগামীতার (subduction) বিপরীত ধর্মী।

মহাসাগরীয় ত্বকের উল্লম্ফন আবার মহাসাগরীয় অঞ্চলের বহু স্থানে নিঃসঙ্গ দ্বীপের সৃষ্টি করে। ঐ সব অঞ্চলে মহাসাগরীয় ত্বক এতটাই উন্নীত হয় যে সাগর পৃষ্ঠ থেকে উঁচু হয়ে এরা নতুন-নতুন দ্বীপের সৃষ্টি করে। নিউজিল্যান্ডের ১১০০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ম্যাকুয়ারী দ্বীপ-এর (Macquarie Island) জন্ম সমুদ্র ত্বকের উল্লম্ফনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই দ্বীপের শিলাসমূহের পর্যায়ক্রমেও ওফিওলাইট পর্যায়ক্রমের শিলাস্তরগুলি বিদ্যমান। এছাড়া পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ইয়াপ দ্বীপমালা (Yap Islands) ও লহিত সাগরের জারগাবাদ (Zargabad) সমুদ্র তলের উল্লম্ফন থেকে সৃষ্টি হওয়া দ্বীপের উদাহরণ। মনে রাখা প্রয়োজন যে সমুদ্র বক্ষে দ্বীপ ও দ্বীপমালার সৃষ্টির নানাবিধ প্রক্রিয়ার মধ্যে সমুদ্র তলের উল্লম্ফন থেকে দ্বীপ সৃষ্টি একটি বিশেষ প্রক্রিয়া।
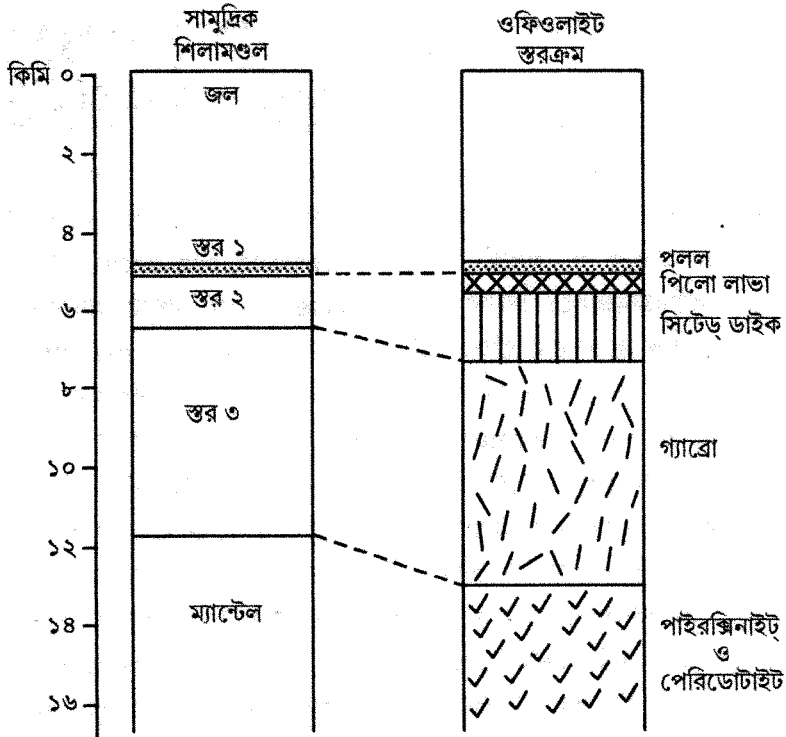
চিত্র-৮ সামুদ্রিক শিলামণ্ডল ও ওফিওলাইট স্তরক্রমের তুলনামূলক স্তম্ভ

চার্লস ডারউইন ও তাঁর বিবর্তন বাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের (চিত্র-৯) (১৮০৯-'৮২) (Charles Darwin) বিজ্ঞানের জগতে আগমন। মাত্র ২২ বছর বয়সে, ১৮৩১-এর ২৭শে ডিসেম্বর ডারউইন এইচ্ এম্ এস্ বিগল্ (H.M.S. Beagle) নামের জাহাজে ইংল্যান্ডের Heven's port থেকে রওনা হন। জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন রবার্ট ফিজরয় (Robert

Fitzroy)। বিগল্ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে আর্জেন্টিনার প্যাটাগোণিয়া ও দক্ষিণের শেষ প্রান্তের টিয়েরা ডেল ফিগো (Tierra del Fuego) সমুদ্র উপকূল জরীপ করা।

চিত্র-৯: চার্লস ডারউইন

প্রায় পাঁচ বছর (১৮৩১-৩৬) বিগলে্ অতিবাহিত করার সময় ডারউইন আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রদক্ষিণ করেন ও উপকূলীয় অঞ্চলের বহু উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের উপর গবেষণা চালান। বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে আকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে সমস্ত প্রাণীই ভূ-তাত্বিক সময়ের (Geological time) সাপেক্ষে খুব ধীর গতিতে বিবর্তিত হয়। তাঁর আরও একটি সিদ্ধান্ত ছিল যে পক্ষীকূল ও স্তন্যপায়ীরা সরীসৃপ থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে একই গোষ্ঠির প্রাণীদের বহিরাঙ্গের যে সমস্ত সাধারণ তফাৎ দেখা যায় তা শুধু তাদের পরিবেশ গত ও জীবনধারণ প্রণালীর তারতম্যের জন্য। এর ফলশ্রুতি হিসাবে তৈরি হলো তাঁর বিখ্যাত 'জীবজগতের বিবর্তন তত্ত্ব' (Theory of Evolution), যা আজও নবজীববিজ্ঞানীদের একটি বহু আলোচিত তত্ব হিসাবে স্বীকৃত। বিগীল্ অভিযান শেষে ফিরে আসার বহু পরে ১৮৫৯-এ তিনি এই মতামত তাঁর বিতর্কিত গ্রন্থ "On the origin of species by natural selection"—এ প্রকাশ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল জীবজগতের বিবর্তন প্রকৃতির স্বাভাবিক পছন্দেই হয়ে থাকে। যদিও ডারউইন বিবর্তণের তাত্বিক দিকের সমস্ত বিষয়গুলির পক্ষে অবিসংবাদিত যুক্তি দিতে পারেননি তবুও জীববিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তাঁর এইসব পর্যবেক্ষণ বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

প্রবাল দ্বীপের জন্ম ও বিবর্তনের ব্যাখ্যা সহ (চিত্র-১০) প্ল্যঙ্কটণ (plankton) জাতীয় ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব ও বার্ণাকেল (barnacle) জাতীয় সামুদ্রিক ঝিণুকের বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা করে সেই সময়েই ডারউইন সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানে আলোরণ সৃষ্টি করেছিলেন। ডারউইনের বিশ্বাস ছিল যে প্রধান তিন ধরণের কোরাল রীফ্ প্রকৃতপক্ষে একটি বিবর্তন প্রক্রিয়ার তিনটি ধারাবাহিক রূপমাত্র। ফ্রিন্জি রীফ্ সাধারণভাবে মহাদেশের বা উদ্গারী দ্বীপের (volcanic island) উপকূলীয় অঞ্চল সংলগ্ন থাকে (চিত্র ১০ক)। মহাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলের বা উদ্গারী দ্বীপের অবনমন (subsidence) হতে থাকলে ঐসব স্থানের উপকূল সংলগ্ন অঞ্চল লেগুনে পরিণত হয় ও রীফ্ উপকূল থেকে দুরে সরে গিয়ে বেরিয়ার রীফ্ সৃষ্টি করে (চিত্র ১০খ)। এর পরবর্তী পর্যায়ে উদ্গারী দ্বীপের আরো অবনমনের সাথে রীফ্ তৈরির প্রক্রিয়া

দ্রুত চলতে থাকলে নিমর্জিত দ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চল লেগুনে পরিণত হয় ও এর সীমানায় বৃত্তাকারে কোরাল অ্যাটোলের সৃষ্টি হয়ে থাকে (চিত্র ১০গ)। ১৮৬৮তে তাঁর "Variation in Animals and Plants under Domestication" ও ১৮৭১-এ তাঁর "The Descent of Man" প্রকাশিত হলে বিজ্ঞানী মহলে তা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

সমুদ্র অভিযানে ডারউইন প্রায়শই সমুদ্র অসুস্থতা বা Sea Sickness-এ ভুগতেন। কিন্তু কোনও রকম অসুস্থতাই তাঁকে সমুদ্র অভিযান ও গবেষণা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। ১৮৮২-র ১৯শে এপ্রিল ডারউইন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। লন্ডনের Westminster Abbey-তে তাঁকে সমাহিত করা হয়।
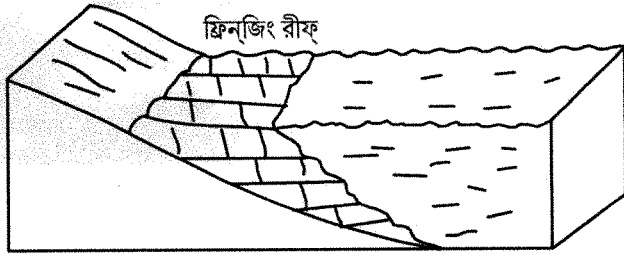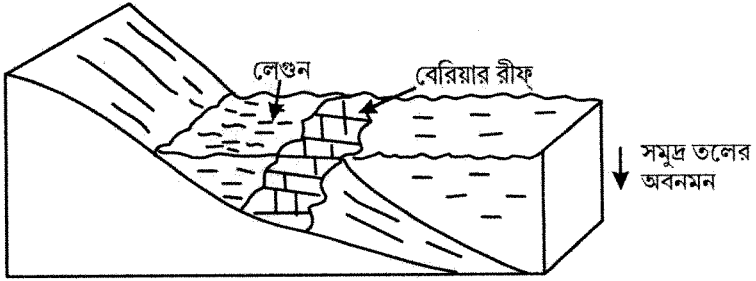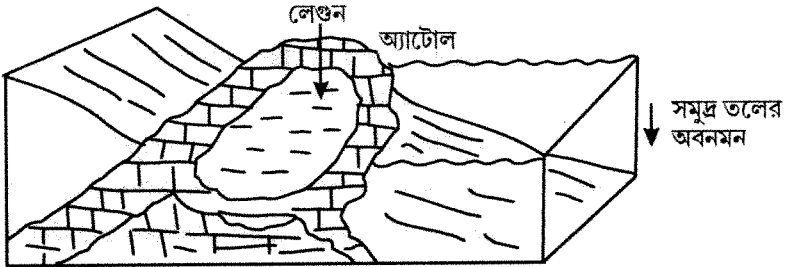
চিত্র-১০ ডারউইনের মতানুসারে একই বিবর্তনের ধারায় ফ্রিন্‌জিং রীফ থেকে বেরিয়ার রীফে ও বেরিয়ার রীফ থেকে অ্যাটোলে বিবর্তন (আর সি সেলী ১৯৭০ অনুসারে)

এডওয়ার্ড ফোর্বস্ ও মহাসমুদ্রে প্রাণের উল্লম্ব বন্টন

প্রাকৃতিক পরিবেশে সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানের বিকাশের ধারা সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সূত্র ধরে সামুদ্রিক জীববিদ্যার গবেষণায় ব্রিটিশ সমুদ্রবিজ্ঞানী এড্ওয়ার্ড ফোর্বস্-এর (১৮১৫-৫৪) (Edward Forbes) কৃতিত্বও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। সমুদ্র পৃষ্ঠের নিচে প্রাণের উল্লম্ব বন্টনের (vertical distribution) প্রকৃতির বিষয় জানার ব্যাপারে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাই বহুবার পর্যবেক্ষণের পর ফোর্বস্ সমুদ্রকে বিভিন্ন রকম প্রাণের অস্তিত্বের ভিত্তিতে কতগুলি নির্দিষ্ট গভীরতা অঞ্চলে (Life depth zone) ভাগ করেন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে উদ্ভিদ জাতীয় প্রাণ সব সময়েই সমুদ্র পৃষ্ঠের উপরিতলে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে বেঁচে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীদের সংখ্যাও এই স্তর ও তার সামান্য গভীরে সব চেয়ে বেশী এবং গভীরতার সঙ্গে এদের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পেতে থাকে। সব চেয়ে গভীরতম অঞ্চলে প্রাণীর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত।

ফোর্বসের সমসাময়িক জীববিজ্ঞানীরা সেই সময় তাঁর সিদ্ধান্তের যোগ্য মর্য্যাদা দেয়নি। তাদের ধারণা ছিল সমুদ্রের গভীরতম অ্যাবিসাল অঞ্চলের অতিরিক্ত চাপ আর আলো ও বায়ুর অভাবে কোন প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় আমরা জানতে পেরেছি যে শুধু গভীরতম সমুদ্রে নয় প্রশান্ত মহাসাগরের মেরিয়ানা খাতেও (প্রায় ১১.২ কিমি গভীরে) প্রাণের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এছাড়া সমুদ্রতলের ঔদকতাপীয় ছিদ্র পথের (hydrothermal vents) আশে-পাশে যথেষ্ট তপ্ত জলের পরিবেশেও মাছ থেকে অন্যান্য প্রাণীরা দিব্যি বেঁচে থাকে।

১৮৪০-‘৫০-এ ফোর্বস্ সমুদ্রতল ড্রেজিং-এর কাজে ব্যাপৃত হন। ব্রিটেনের সমুদ্র-তল ছাড়াও ‘এজিয়ান সি’ (Aegean Sea) ও অন্যান্য সমুদ্রে তিনি ড্রেজিং-এর কাজ চালাতে থাকেন। সমুদ্র তলের খনিজ সহ কাঁদা ও বালি সংগ্রহ করে তাদের উপাদানের উপর গবেষণা চালান। কিন্তু বহু সম্ভাবনাময় এই জীববিজ্ঞানীর অতি অল্প বয়সেই কর্মজীবনে ছেদ পরে। ১৮৫৪-তে মাত্র ঊনচল্লিশ বছর বয়সে ফোর্বসের মৃত্যু হয়।

পরিচ্ছেদ-৭

চার্লস ওয়াইভিল্ থমসন্ ও এইচ্ এম্ এস্ চ্যালেঞ্জর অভিযান

আধুনিক সমুদ্র-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের দরজা খুলে দেওয়ার ব্যাপারে চার্লস্ ওয়াইভিল্ থমসনের (চিত্র-১১) (১৮৩০-১৮৮২) (Charles Wyville Thomson) নাম অগ্রগণ্য। ১৮৩০-র ৫ই মার্চ স্কটল্যান্ডে থমসনের জন্ম। ৪০ বছর বয়সে, ১৮৭০-এ থমসন ভূমধ্যসাগর অভিযান শেষ করে ১৮৭২-এ তাঁর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ গ্রন্থ "The depths of the sea" প্রকাশ করেন। এর ফলে সমুদ্র বিজ্ঞানের জগতে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি হয় ও আটলান্টিক, প্রশান্ত ও দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানোর জন্য সরকারী আনুকূল্যে চ্যালেঞ্জার অভিযানের আয়োজন করা হয়। থমসন্ এই অভিযানের নেতা নির্বাচিত হন। ১৮৭২ সালের ২১শে ডিসেম্বর ২৩০৬ টনের কাঠের বাষ্পচালিত করভেট (corvette) বা ছোট রণতরী এইচ্ এম্ এস্ চ্যালেঞ্জার (H.M.S. Challenger) (চিত্র-১২) নাম নিয়ে ইংল্যান্ডের পোর্ট মাউথ থেকে সাড়ে তিন বছরের জন্য (১৮৭২-১৮৭৬) বেরিয়ে পড়ে। এই সমুদ্র অভিযানে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনে তার মূল্য অপরিসীম।

চিত্র-১১: চার্লস্ ওয়াইভিল্ থমসন

চিত্র-১২: এইচ্ এম্ এস্ চ্যালেঞ্জার
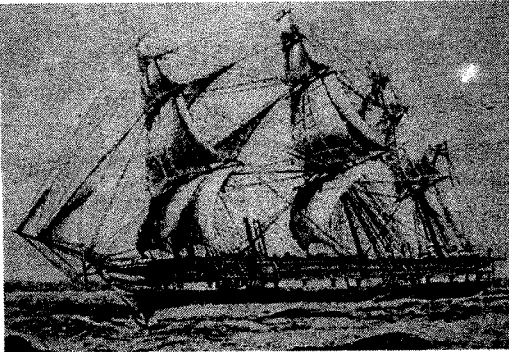
এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক থমসনের নেতৃত্বে সংগঠিত চ্যালেঞ্জার অভিযানের প্রধান নাবিক ছিলেন অভিজ্ঞ জরীপ বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন জি.এস্ নারেস (G.S. Nares)। মোট ৬৮,৮৯০ মাইল দীর্ঘ পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী

সে যুগের চ্যালেঞ্জার সুসজ্জিত ছিল একাধীক গবেষণাগার, অতিরিক্ত কেবিন ও বিশেষভাবে তৈরি ড্রেজিং প্ল্যাটফর্ম দিয়ে। সমুদ্রের গভীরে বিভিন্ন পদার্থের নমুনা সংগ্রহের জন্য ছিল বিভিন্ন মাপের হাজার হাজার পাত্র। জৈবিক পদার্থ সংরক্ষণের জন্য অ্যাল্‌কোহল্‌, জলের নমুনা সংগ্রহের উপযুক্ত কাচের যন্ত্রপাতি, থার্মোমিটার এমনকি অনুবীক্ষণ যন্ত্রও জাহাজে রাখা ছিল। এছাড়া সমুদ্র তলের পলি সংগ্রহের জন্য একাধীক ড্রেজারের ব্যবস্থা ছাড়াও ৩৬২টি স্থানে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ মিটার গভীর পর্যন্ত অঞ্চলে শব্দ প্রেরণ ও প্রতিফলনের সাহায্যে সমুদ্রতলের বিভিন্ন স্থানের গভীরতা নির্ণায়ক ইকোসাউন্ডারের ব্যবস্থা রাখা ছিল। চ্যালেঞ্জার তার যাত্রাপথে ৩৫৪টি স্থান থেকে সমুদ্র তলের বিভিন্ন পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করে। জৈব ও অজৈব বিভিন্ন রকম নমুনার উপর সূক্ষ পরীক্ষা চালানোর জন্য অধ্যাপক থমসন এই অভিযানে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নিয়েছিলেন যাতে জাহাজের গবেষণাগারেই সংগৃহীত নমুনা সমূহের উপর গবেষণার কাজ শেষ করা যায়।

রসায়নবিদ্‌ জন ইয়ঙ্‌ বুকান্যান্‌ (John Young Buchanan) প্রধাণত জলের নমুনা পরীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। ড্রেজার ও জালে সংগৃহীত প্রাণীদের পরীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন থমসন্‌ নিজে ও তাঁর তিন সঙ্গী জীববিজ্ঞানী। সামুদ্রিক প্রবাল ও স্কোয়ার্ট-এর (squirts) উপর বিশেষজ্ঞ ছিলেন এইচ্‌ এন্‌ মোস্‌লে (H.N. Moseley)। চিংড়ি, কাঁকড়া ও অন্যান্য ক্রাস্‌টাশিয়ান চেনা ও তাদের পরীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন রুডফ ভন্‌ উইলিমোস্‌ সূম (Rudoft Von Willemoes Suhm)। পেলজিক বা দূরসামুদ্রিক প্রাণী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জীব সম্বলিত পলির গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন জন্‌ মুরে (John Murray)। যাত্রা কালে বিজ্ঞানী, প্রায়োগিক, নাবিক ও খালাসির ২৪৩ জনের মধ্যে সাড়ে তিন বছরের পরিক্রমায় মোট ১০ জন প্রাণ হারান। এদের মধ্যে অন্যতম, বিজ্ঞানী আর. ভি. ডাবলিউ সূম। জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে থাকার সময় এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এরপরই ১৮৭৬ সালের ২৪শে মে চ্যালেঞ্জার ইংল্যান্ডের স্পিটহেডে (Spithead) ফিরে আসে।

চ্যালেঞ্জার অভিযানে গভীর সমুদ্রের তাপ ও তার তারতম্যকে নির্দেশক হিসাবে কাজে লাগিয়ে থমসনই প্রথম সুদীর্ঘ আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল জুড়ে একটি দীর্ঘ অন্তঃসাগরীয় পর্বতমালার অবস্থানের প্রমাণ দাখিল করেছিলেন। এর প্রায় ৫০ বছর পর ১৯২৫ থেকে '২৭-এ জার্মান অভিযানে (German Expedition) থমসনের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। আটলান্টিকের মধ্যবর্তী অঞ্চলের এই পর্বতমালাই 'মধ্য আটলান্টিক শৈল শিরা (Mid Atlantic Ridge) নামে পরিচিত হয়েছে। এই শৈল শিরার মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে অনবরত অগ্ন্যুদ্‌গিরণ হয় বলে এই অঞ্চল জুড়ে সমুদ্রের গভীরে জলের তাপ তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে অনেক বেশী। চ্যালেঞ্জার অভিযানে থমসনের এই পর্যবেক্ষণ সামুদ্রিক ভূবিদ্যার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

এছাড়া গভীর সমুদ্রে প্ল্যাঙ্কটন্‌ বা প্রবাহ-তাড়িত জীব ও অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহাবশেষ

দিয়ে তৈরি উজ্ (ooze) জাতীয় পলির সন্ধানও প্রথম পাওয়া গিয়েছিল এই অভিযান থেকেই। প্রশান্ত মহাসাগরের তথা পৃথিবীর অন্যতম গভীর খাত মেরিয়ানায় পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ঐ গভীরতায় অবস্থিত জীব ও তাদের বৈচিত্রের নানান তথ্য আমাদের প্রথম জানায় চ্যালেঞ্জার। এই অভিযানে থমসন্ সমুদ্র ত্বকের চৌম্বকত্ব ও সামুদ্রিক আবহাওয়া বিষয়ক নানান তথ্য সংগ্রহ করেন। উত্তর আটলান্টিকের ফারো (Faroe) দ্বীপ ও স্কটল্যান্ডের মধ্যবর্তী ২০০ কিমি দীর্ঘ উদ্গারী আগ্নেয় শিরা (Volcanic ridge) আবিষ্কারের জন্য তাঁর নামেই ঐ শিরার নামাকরণ হয়েছে "ওয়াইভিল্ থমসন্ শিরা" (Wyville Thomson Ridge)। ১৮৭৭-এ থমসন্ "The Voyage of the Challenger" নামে চ্যালেঞ্জার অভিযানের এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। চ্যালেঞ্জার অভিযান শেষে ফিরে আসার পর থমসন্কে Knight বা স্যার উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁর উপরেই দায়িত্ব পড়ে অভিযানের সংগৃহীত বিভিন্ন বিষয়ের নমুনাগুলির শ্রেণী বিভাগ করে সেগুলিকে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার ও এই অভিযানের একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করার। স্বভাবে অস্থির থমসনের সঙ্গে এই পর্যায়ে বহু বিজ্ঞানীরই বাদানুবাদ ও মতান্তর ঘটতে থাকে। এর ফলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গেও তাঁর মতান্তর ঘটে। এই সংস্থা চেয়েছিল সংগৃহীত সব নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছে দিতে। তারা থমসন্কে জানালেন যে তিনি যেন তাঁর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যালয় থেকে ঐ সব সংগৃহীত নমুনা বিভিন্ন গবেষণাগারে না পাঠান। থমসন্ এই প্রস্তাব মেনে নিতে না পারায় দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্ব যখন তুঙ্গে তখন রয়াল সোসাইটির সহযোগিতায় থমসন্ এই বিতর্কে জয়ী হন। কিন্তু বিশাল এই অভিযানের পূর্ণাঙ্গ সরকারী রিপোর্ট তৈরির সঙ্গে সরকারী অর্থের পুঙ্খানুপঙ্খ হিসাব রাখা থমসনের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়েছিল। ১৮৭৯-তে কাজের ভয়ঙ্কর চাপে থমসন্ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে এডিনবরার অধ্যাপকের পদে ইস্তফা দিতে হয়। ১৮৮২-তে মাত্র ৫২ বছর বয়সে অনন্য সাধারণ এই কর্মবীর বিজ্ঞানীর জীবনাবসান ঘটে।

চিত্র-১৩: জন মুরে

থমসনের মৃত্যুর পর জন মুরে (চিত্র-১৩) (১৮৪১-১৯১৪) তাঁর অসম্পূর্ণ কাজের দায়িত্ব নেন ও অসাধারণ দক্ষতায় এইচ্ এম্ এস্ চ্যালেঞ্জার অভিযানের সামগ্রিক বৈজ্ঞানীক রিপোর্ট ৫০টি গ্রন্থে প্রকাশ করেন। অভিযান আরম্ভের ২৩ বছর পরে ১৮৯৫-তে ২৯,৫৫২ পাতার এই বিশাল রিপোর্টে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন

বহু বিজ্ঞানী। সমুদ্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য এই রিপোর্ট এক মহামূল্যবান দলিল হয়ে আছে। এই অভিযানে ৪৫০০-এর উপর নতুন প্রজাতীয় প্রাণীদের সনাক্তকরণ, বিবরণ ও বিশ্লেষণ আজও জীববিজ্ঞানীদের কাছে এক রোমহর্ষক বিষয়। শারীরিক কারণে ও অকাল মৃত্যুতে থমসন্ তাঁর আরাধ্য শেষ কাজটি করে যেতে পারেননি। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের নিয়ে দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় নিষ্ঠার সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণায় যে অনুরাগ তিনি দেখিয়েছিলেন বর্তমান প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের কাছে আজ তা এক শিক্ষণীয় বিষয়।

স্যার জন মুরে চ্যালেঞ্জার অভিযানে থমসনের সহকারী বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করার সময় গভীর সমুদ্রের জৈব পলিতে (deep sea ooze) প্রবাহতাড়িত সূক্ষ্ম প্রাণীদের ভূমিকার উপর অসাধারণ গবেষণা করেছিলেন। চ্যালেঞ্জার অভিযানের রিপোর্ট তৈরি হওয়ার পর মুরে তাঁর পরবর্তী কালের সহকর্মী জে জোর্টের সঙ্গে (J. Hjort) ১৯১২ তে "The depth of the ocean" গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তাঁরা সমুদ্রের গভীরে বিভিন্ন অঞ্চলে রেড্ ক্লে (Red Clay), গ্লোবিজেরিনা উজ্ (Globigerina ooze) ও টেরোপড্ উজ্ (Pteropod ooze) এর অবস্থানের বিন্যাস ব্যাখ্যা করেন। আজও পর্যন্ত এই বিষয়ের উপর এই রচনাই একটি প্রামান্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

ফ্রিডফ্ ন্যানসেন্ ও তাঁর উত্তর মেরু অভিযান

চ্যালেঞ্জার অভিযানের পর এক অস্বাভাবিক সমুদ্রযাত্রার কাণ্ডারী ছিলেন নরওয়ের বিজ্ঞানী ফ্রিডফ্ ন্যানসেন্ (১৮৬১-১৯৩০) (Fridtjof Nansen)। এর অদম্য ইচ্ছা ছিল উত্তর আটলান্টিক ও সুমেরু অঞ্চলে অনুসন্ধান চালানো। ইতিপূর্বে আমেরিকার অভিযাত্রী জর্জ ওয়াশিংটন ডীলং (George Washington Delong) তাঁর সঙ্গী নাবিকদের নিয়ে Jeanette নামের জাহাজে বেরিং প্রণালীর মধ্যে দিয়ে সুমেরুর নিকটবর্তী Wrangell দ্বীপ পেরিয়ে উত্তর মেরু অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৭৯-র ৬ই সেপ্টেম্বর Jeanette সেখানকার কঠিন বরফে আটকা পড়ে যায়। বরফের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে দু-বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর জাহাজটি নিউ সাইবেরিয়ান দ্বীপের নিকট নিমর্জিত হয়। ডীলং ও তাঁর সঙ্গীরা পূর্ব সাইবেরিয়ার লেনা বদ্বীপ (Lena Delta) অঞ্চলে মারা যান। এই ঘটনা ন্যানসেনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তিনি সুমেরু অভিযানে যাওয়ার পরিকল্পনা স্থির করে ফেলেন।

১৮৮৪-র পর ন্যানসেন্ Fram নামের একটি জাহাজ তৈরি করান। এর বৈশিষ্ট্য ছিল বরফের সাম্রাজ্যে চলার সময় বরফের অবয়ব বৃদ্ধিতে Fram ভেঙে যাবে না। ১৩ জনের একটি নাবিক ও খালাসির দলের প্রায় ৫ বছরের রসদ নিয়ে ১৮৯৩-এর ২৪শে জুন ন্যানসেন অস্‌লো থেকে যাত্রা শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল নিউ সাইবেরিয়ান দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে বরফের স্তর অতিক্রম করে অনুকূল স্রোতের মধ্যে দিয়ে উত্তর মেরুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। ১৮৯৫-এর ১৫ই নভেম্বর Fram উত্তর মেরু থেকে মাত্র ৩৯৪ কিমি দূরে উত্তর মেরু বলয়েব এক বিন্দুতে পৌঁছে যায়। Fram-এর এই অভিযান প্রমান করেছিলো যে উত্তর সাগরে কোনও

মহাদেশের অস্তিত্ব নেই এবং উত্তর মেরু অঞ্চলকে ঢেকে রাখা বরফ কোনও হিমবাহ থেকে সৃষ্টি হয়নি। বরং এরা সমুদ্রের উপরিপৃষ্ঠে স্বাচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ানো জমা বরফের স্তরমাত্র। এই অভিযানেই জাহাজের নাবিকরা গভীরতা নির্ণয় করে দেখালেন যে সুমেরু অঞ্চলে সমুদ্র ৩০০০ মিটারেরও বেশী গভীর। আরো একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার ছিল এই যে এখানকার বরফের নিচে ১৫০-৯০০ মিটার গভীরে এমন একটি জলস্তর আছে যার তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশী, প্রায় ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের কাছাকাছি। ন্যানসেন বুঝতে পেরেছিলেন যে এই জলস্তর আটলান্টিক থেকে আসা অধিক লবনাক্ত জল যা সুমেরু অঞ্চলের কম লবনাক্ত জলের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এইসব সমীক্ষা করার সময় ন্যানসেন লক্ষ্য করেছিলেন যে সমুদ্রের তলের বিভিন্ন অঞ্চলের জলের তাপ, উপাদান ও লবনাক্ততা পরীক্ষা করতে হলে জলের নমুনা সংগ্রহের বোতল আরও নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন। আগে যে বোতলের সাহায্যে সমুদ্রের জল উত্তোলন করে জলের তাপ ও লবনাক্ততা মাপা হতো তিনি তার থেকে বেশী সূক্ষ নমুনা সংগ্রাহক বোতল উদ্ভাবন করলেন যা পরে তাঁর নামে 'ন্যানসেন্ বোতল' নামে পরিচিত হয়েছে। এছাড়া বাতাসের সাপেক্ষে বরফের অনুবাহিত হওয়ার দিকের বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে স্ক্যানডিনেভিয়ার পদার্থবিদ্ ভি. ওয়ালফ্রেড একম্যান (V. Walfred Ekman) তাঁর Ekman spiral তত্বের সৃষ্টি করেন ও সেই বিষয়ের গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন। এই আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভৌত সমুদ্রবিদ্যায় নতুন জগতের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। ন্যানসেন সারা জীবন শান্তির দূত হিসাবে কাজ করে গেছেন। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২২শে ন্যানসেন নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।

পরিচ্ছেদ-৮

আলফ্রেড ওয়েগেনার ও তাঁর মহীসঞ্চরণ প্রকল্প

১৯১২ তে জার্মান আবহাওয়াবিদ্ আলফ্রেড ওয়েগেণার (১৮৮০-১৯৩০) (চিত্র-১৪) (Alfred Wegener) তাঁর মহীসঞ্চরণ প্রকল্প (Continental Drift Hypothesis) পেশ করেন। কিন্তু প্রামান্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূভৌত বিষয়ক সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকায় তাঁর এই যুগান্তকারী প্রকল্প তখন যথাযোগ্য স্বীকৃতি পায়নি।

চিত্র-১৪: আলফ্রেড ওয়েগেণার

ওয়েগণারই প্রথম বলেছিলেন যে আজকের মহাদেশগুলি অতি আদিম এক সময়ে অতিকায় এক মহাদেশ 'প্যান্‌জিয়া' (Pangia) নামে বিদ্যমান ছিল। আর তখন ছিল এক অতিকায় মহাসাগর যার নাম প্যান্‌থালাসা (Panthalassa)। প্যালিওজোয়িক (Palaeozoic) যুগের শেষে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে এই মহাদেশ ক্রমশ বিভাজিত হয়ে একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আরম্ভ করে। বিচ্ছিন্ন ও অনুবাহিত এই সব মহাদেশগুলির অন্তর্বর্তী অঞ্চলেই বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগরেরা নিজেদের স্থান করে নেয়। তাঁর এই ধারণার সমর্থনে তিনি বহু যুক্তিও উপস্থাপন করেন। আটলান্টিক মহাসাগরের দুই পাশের মহাদেশগুলির সীমানার সহচার (parallelism) ও সাদৃশ্যকেও তিনি তাঁর প্রকল্পের সমর্থনে ব্যবহার করেন। যদিও ওয়েগেণারের প্রায় একশো বছর আগেই প্রখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও সমুদ্র অভিযাত্রী আলেকজান্ডার ভন্ হামবোল্ট্ (Alexander Von Humboldt) আটলান্টিকের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মহাদেশগুলির সীমানার সহচার ও পারস্পারিক মিল লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু মহীসঞ্চলন প্রকল্পের জনক হিসাবে ওয়েগেণারের বক্তব্য ও যুক্তি ছিল আরো অনেক বেশী তথ্যনির্ভর। অন্তর্বর্তী মহাসাগরের বিপরীতে অবস্থিত মহাদেশগুলির সীমানার পললস্তরের সাদৃশ্য ও জীবাশ্মের সাদৃশ্যকেও তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ব্যবহার করেন।

ওয়েগেণার বলেছিলেন প্যান্‌জিয়া ভেঙে প্রথমে দু-টুকরো হয়ে যায়। উত্তর গোলার্ধের

দিকে অনুবাহিত ভূখণ্ড 'অ্যান্গারাল্যান্ড' আর মধ্য ও দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে অনুবাহিত ভূখণ্ড 'গন্ডোয়ানাল্যান্ড নামে পরিচিত হয়। এই গন্ডোয়ানাল্যান্ডই পরে বিভাজিত ও অণুবাহিত হয়ে আজকের আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, অ্যানটার্কটিকা, ভারত ও মাদাগাসকার রূপে বিরাজমান (চিত্র-১৫), আর এদের অন্তর্বর্তী স্থানগুলিতে বিরাজ করছে সুবিশাল সাগর ও মহাসাগরগুলি।

ওয়েগেণারের আগে মানুষ বিশ্বাস করতো কোনো মহাসাগরের দুই বিপরীত প্রান্তের মহাদেশগুলির মধ্যে সংযোগকারী কোন ল্যান্ডব্রিজ বা স্থলসেতুর অস্তিত্ব ছিল। ওয়েগেণারই প্রথম এই ধারণার প্রতিবাদ করেন। ১৯১৫-তে লেখা তাঁর 'দি অরিজিন্ অফ্ কন্টিনেন্ট' (The Origin of Continent) গ্রন্থে তিনি মহীসঞ্চরণ প্রকল্পের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। ওয়েগেণারের মতে প্রধানত গ্র্যানিট শিলায় তৈরি মহাদেশগুলি নিচের ভারী ব্যাসল্টের ম্যাগমার উপর হিমশৈলের মত ভাসমান অবস্থায় থাকে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ শক্তিতে তাড়িত হয়ে ভাসতে ভাসতে এরা একে অন্যের সাপেক্ষে সরে যাচ্ছে। ওয়েগেণারের এইসব মতবাদ ভূবিজ্ঞানে বড় ধরণের আলোড়ন সৃষ্টি করলেও কিছু কিছু দুর্বলতার কারণে সুদীর্ঘ সময়ের জন্য বিরাট বিতর্কেরও সৃষ্টি করেছিল। ওয়েগেণার তাঁর সময়ে মহাদেশগুলির সঞ্চরণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির রূপরেখা ও অন্যান্য জটিল ভূভৌতবিষয়ক ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত ও সাযুয্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। ফলে
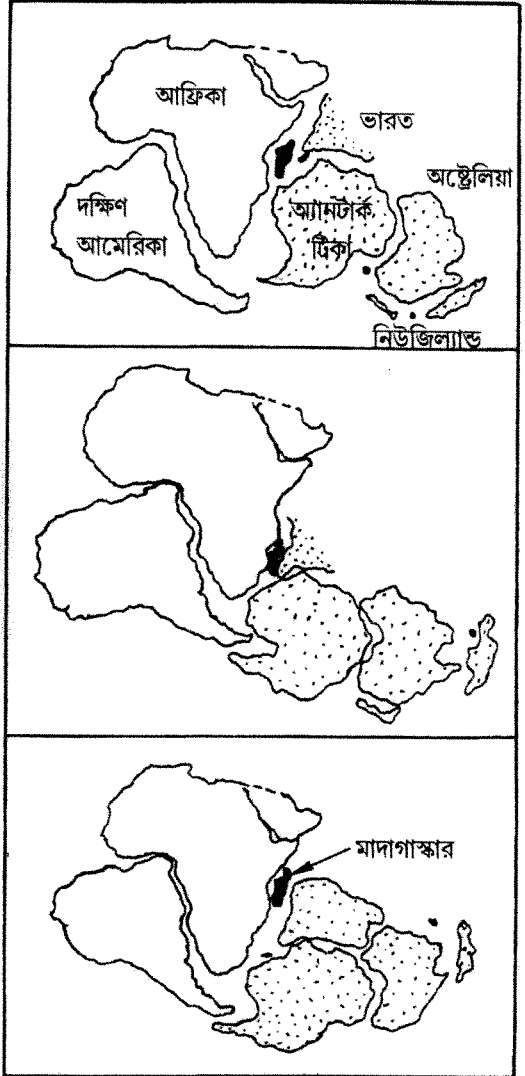
চিত্র-১৫ ঃ গন্ডোয়ানাল্যান্ডের তিনটি সম্ভাব্য পুর্ণগঠন নমুনা দেখানো হয়েছে। ভারত ও মাদাগাস্কারের বিভিন্ন অবস্থান লক্ষ্যণীয়।

ভূভৌতবিজ্ঞানীরা তাঁর প্রকল্পের কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন প্রধানত দুটি কারণে। (ক) ম্যান্টেলের চলমান ম্যাগমার উপর দিয়ে মহাদেশগুলির অনুবাহিত হওয়ার শক্তি ও উৎস সম্বন্ধে অস্পষ্টতা, (খ) কিছু কিছু স্থলভূমির একটি নির্দিষ্ট সময় সরণী (time table) মেনে নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করার অসম্ভাব্যতা। যদিও ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাঁর প্রকল্পের প্রচুর সমর্থন মিলেছিল তবুও মহাদেশগুলির অনুবাহ প্রক্রিয়ার যথাযথ ব্যাখ্যা না থাকায় ষাটের দশকের আগে ওয়েগেণারের প্রকল্প সাধারণভাবে গৃহীত হয়নি। এ সব সত্বেও ভূবিজ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের কাছে ওয়েগেণারের এই প্রকল্প বিশেষ উৎসাহের বিষয় হয়ে ওঠে। তিনিও তাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর এই মতবাদকে সুদৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে এই প্রকল্পের সমর্থনে অকাট্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি গ্রীণল্যান্ড যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানেই কর্মরত অবস্থায় গ্রীণল্যান্ডের স্তূপীকৃত বরফের মধ্যেই তাঁর জীবনবসান হয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তণ আর ওয়েগেণারের সম্ভব হয়নি। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ওয়েগেণারের মহীসঞ্চালন প্রকল্প প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থাতেই থেকে যায়।

পঙ্কিল প্রবাহ ও ফিলিপ এইচ্ কুইনেন

পঙ্কিল প্রবাহ (turbidity current) সাধারণভাবে পলল অভিকর্ষ প্রবাহ (sediment gravity flow) জাত ঘোলা জলের স্রোত যারা উপকূলীয় অঞ্চলের উপর থেকে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রবাহিত হয়। এর ফলে এদের দ্বারা বাহিত হয়ে গভীর সমুদ্রে প্রচুর পরিমান পলির অবক্ষেপণ ঘটে। তৈরি হয়, গভীর সমুদ্র তলের সমভূমি বা 'অ্যাবিসাল্ প্লেন' (abyssal plain)। উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিকম্প বা ল্যান্ড স্লাইড্ থেকে তৈরি হয় বলে সমুদ্রের জলের সঙ্গে পলির সংমিশ্রণে এদের ঘনত্ব পারিপার্শ্বিক জলের তুলনায় অনেক বেশী। ফলে উপকূলের গা বেয়ে নেমে আসার সময় এদের চলার পথে গভীর মহীখাত বা deep sea canyon-এর সৃষ্টি হয়।

চিত্র-১৬: ফিলিপ এইচ কুইনেন

ফিলিপ এইচ কুইনেন (চিত্র-১৬) (১৯০২-১৯৭৬) (Philip H. Kuenen) ১৯৩৭-এ মহীখাতের উপর প্রথম গবেষণা করে দেখিয়েছিলেন যে পাঙ্কিল প্রবাহ ভারী বলে এদের ক্ষয় সাধনের ক্ষমতা আছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা উপকূল থেকে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত ছুটে যাওয়া মহীখাতগুলির সৃষ্টির জন্য দায়ী। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে পঙ্কিল প্রবাহে আবর্ত থাকার জন্য মিশ্রিত পলির ছোট দানাগুলিকে এরা অনবরত ভাসমান (suspension) অবস্থায় রেখে দেয় (চিত্র-১৭)।
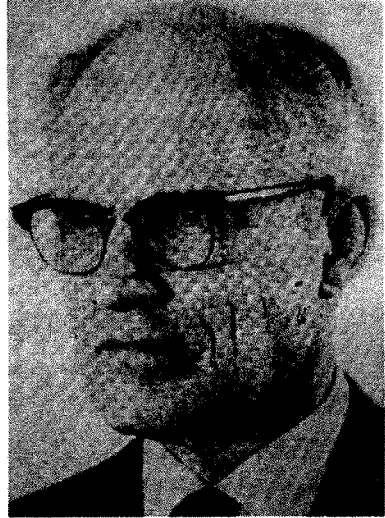
ফলে এদের দ্বারা অধক্ষেপিত হয়ে সমুদ্রতলে সৃষ্টি হওয়া ক্রমিক স্তরায়ণ (চিত্র-১৮) (graded bedding) গভীর সমুদ্রের একটি বিশেষ পাললিক গঠন (sedimentary structure) তৈরী করে। এই স্তরায়নে নিচ থেকে ক্রমশ উপরের দিকে বড় কর্করীয় দানা থেকে ক্ষুদ্রতম কর্করীয় দানা সজ্জিত থাকে। ১৯৫০-এ কুইনেন ও তাঁর সহযোগী সি আই মিগ্‌লিওরিণি (C.I. Migliorini) "Turbidity Currents as a cause of Graded Bedding" নামে পঙ্কিল প্রবাহের কার্যকরণের বিষয়ে এক অসাধারণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এরপর গভীর সমুদ্রে সৃষ্টি হওয়া মহীখাতগুলির পথ পর্যবেক্ষণ করে ১৯৫৫-তে এইচ্ ডাব্লু মেনার্ড (H.W. Menard) দেখালেন যে অতিরিক্ত ঘনত্ব সম্পন্ন পঙ্কিল প্রবাহও কোরিওলিস বলের (Coriolis Force) প্রভাবে উত্তর গোলার্ধে বাঁ দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ডান দিকে বাঁক নেয়।
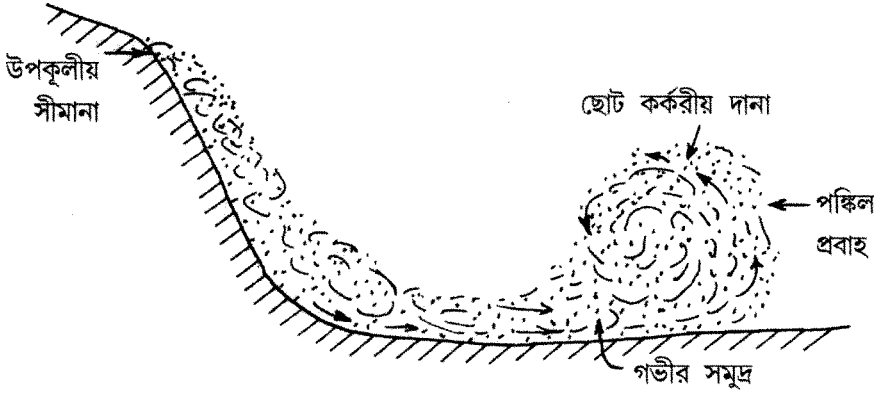
চিত্র-১৭ পঙ্কিল প্রবাহ উপকূলীয় অঞ্চল থেকে গভীর সমুদ্রতল পর্যন্ত ধাবমান।

চিত্র-১৮ গভীর সমুদ্রের অবক্ষেপ। সবচেয়ে নিচের স্তর দুটি ক্রমিক স্তরায়ণের।

ফ্রানসিস্ পি শেপার্ড ও তাঁর ভৌত সমুদ্রবিদ্যা থেকে ভূতাত্ত্বিক সমুদ্রবিদ্যার পর্যবেক্ষণ

সামুদ্রিক ভূবিদ্যার ব্যাপ্তিতে ফ্রানসিস্ পি শেপার্ডের (চিত্র-১৯) (১৮৯৭-১৯৮৫) (Francis P. Shepard) গবেষণার মূল্য অপরিসীম। সমুদ্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শেপার্ড বিচরণ করেছেন। দুটি মহাদেশের প্রায়-সংঘর্ষ থেকে তৈরি হওয়া মধ্যবর্তী সমুদ্রকে ১৯৪৮-এ শেপার্ডই প্রথম 'ভূমধ্যসাগর' বা 'Mediterranean Sea' নামে অভিহিত করেন। এইসব সমুদ্রগুলি সাধারণ ভাবে আকারে ছোট, সৃষ্টির রহস্যে জটিল ও মহাদেশগুলির অন্তর্বর্তী। আজকের ভূমধ্যসাগর ছাড়া এই ধরণের আরো অনেক সমুদ্র বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান।
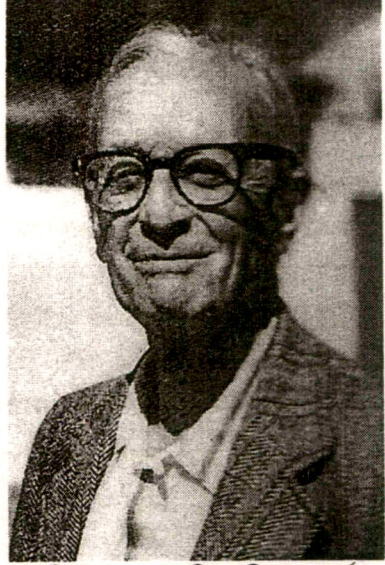
চিত্র-১৯: ফ্রানসিস্ পি শেপার্ড

১৯৫০-এ শেপার্ড ও ডি এল ইন্ম্যান (D.L. Inman) উপকূলীয় স্রোতের কক্ষ ধরে আর্বতিত হওয়ার বিষয়ে একটি মডেল উপস্থাপন করেন যা "Nearshore Circulation" নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তাঁরা দেখালেন উপকূলের সমান্তরাল হয়ে আসা ভগ্নতরঙ্গ (breaker) থেকে কীভাবে অনুতটীয় স্রোত (longshore current) ও উজাণিতটী স্রোতের (rip currant) সৃষ্টি হয়। উজানিতটী স্রোতই বা কীভাবে সংহত প্রবাহের (mass transport) দ্বারা চালিত হয়ে আবার উপকূলে ফিরে আসে এই মডেলে শোপার্ড চিত্র সহ তার ব্যাখ্যা দেন (চিত্র-২০)।
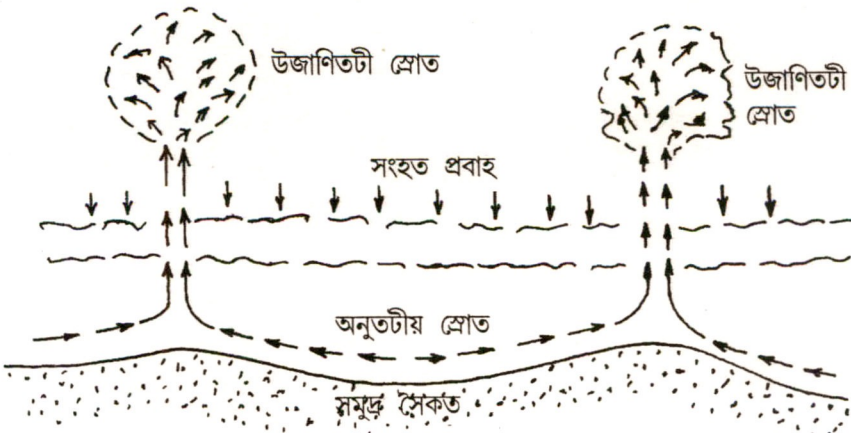
চিত্র-২০ উপকূলীয় স্রোতের কক্ষবিভক্ত আবর্তন (শেপার্ড ও ইনম্যানের মডেলের অনুকরণে)

১৯৬১ তে শেপার্ড বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত বালি, সিল্ট ও কাদা যুক্ত পলির একটি সহজ শ্রেণীবিভাগ করেন। ত্রিভূজাকৃতি একটি চিত্রের সাহায্যে সব ধরণের কর্করীয় পললের শ্রেণীবিভাগে শেপার্ডের এই কাজ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৬১-তেই শেপার্ড ও তাঁর সহকর্মী আর এফ্ ডিল (R.F. Dill) মহীখাতের উপর গবেষণা করে দেখালেন যে বৃহৎ নদীগুলির ব-দ্বীপ অঞ্চলের প্রান্তে শুরু হয়ে গভীর সমুদ্রতল পর্যন্ত প্রসারিত মহীখাতগুলির দৈর্ঘ ৫০ কিমি বা তার কাছাকাছি। এঁরা সবচেয়ে বড় দৈর্ঘের মহীখাত পেয়েছিলেন দক্ষিণ বেরিং সাগরের উপকূলে। ১৯৪৮-এর পর ১৯৬৩তে শেপার্ডের "Submarine Geology"-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেই তিনি লিখলেন যে পৃথিবীব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০-১৩০ মিটার গভীরে মহীসোপান থেকে মহীঢালের মধ্যে অবক্রমের (gradient) একটি স্পষ্ট বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। অবক্রমের এই বিভাজিকাটিই মহীসোপান ছেদ (Continental shelf break) নামে পরিচিত। শোপর্ডের এই পর্যবেক্ষণের প্রায় এক দশক পরে বিজ্ঞানীরা মহীসোপানের এই ছেঁদকে আজ থেকে ১৭ লক্ষ বছর আগের "Quaternary" সময়ের সর্বনিম্ন সাগর পৃষ্ঠের স্থিতিশীল অবস্থার চিহ্ন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

উপকূলীয় সমুদ্র থেকে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শেপার্ডের গবেষণা ছাড়িয়ে আছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের নিচে মহাদেশের সীমানা দিয়ে ধাবিত মহীখাতের উপর গবেষণা করে ১৯৭৩-এ তাঁর "Submarine Geology"-র তৃতীয় সংস্করণে শেপার্ড জানালেন যে মহীখাতগুলি সমুদ্রের অগভীর থেকে গভীর অঞ্চলের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। তাই সমুদ্র সৈকত বা ব-দ্বীপের নিকটবর্তী মহীখাতগুলি সেখানকার অগভীর অঞ্চলের বহু পরিমান পলি বহন ক'রে গভীর সমুদ্রতলে অবক্ষেপণ করে ও সেখানকার ভূমিরূপের (morphology) পরিবর্তন ঘটায়। একই সঙ্গে সৈকত ও ব-দ্বীপের পলিসঞ্চয়নের ভারসাম্যও বিপর্যস্থ হ'তে থাকে।

পরিচ্ছেদ-৯

জে. টি. উইলসন্ ও পরিবর্তী চ্যুতি

ওয়েগেণারের চিন্তা ভাবনার পরবর্তী অধ্যায়ে কানাডীয় ভূপদার্থবিজ্ঞানী জে টি উইলসন (চিত্র-২১) (J.T. Wilson) ওয়েগেণারের মহীসঞ্চলন প্রকল্পের উপর নতুন ভাবে গবেষণা আরম্ভ করেন। উইলসনই প্রথম বলেছিলেন যে মহীসঞ্চলনের পক্ষে ওয়েগেণারের উপস্থাপিত বহু প্রমাণই সঠিক। তিনি এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে ওয়েগেণারের সমকালীন বিজ্ঞানীরা অনেকেই তাঁর এই প্রকল্পের ত্রুটী-বিচ্যুতি নিয়ে যতটা মুখর হয়েছিলেন ততটা তাঁর দেওয়া সঠিক যুক্তিগুলির সপক্ষে চিন্তা-ভাবনা করেননি।

চিত্র-২১: জে টি উইলসন

১৯০৮-এ জন্মগ্রহণ করে মাত্র ১২ বছর বয়সে উইলসন ভূবিজ্ঞানে আকৃষ্ট হন ও পরবর্তী সময়ে অসংখ্য সমুদ্র অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সামুদ্রিক দ্বীপের বয়স ও পরিবর্তী চ্যুতির (transform fault) সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উপর তাঁর গবেষণা পরবর্তী কালে সমুদ্রতলের প্রসারণ (Sea floor spreading) প্রকল্পে পৌঁছতে প্রভূত সাহায্য করেছে। প্লেট টেক্‌টণিকস্ (Plate tectanics) তত্বের অনেক মৌলিক বিষয় সমাধানেও তাঁর গবেষণা এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। ওয়েগেণারের মহীসঞ্চরণ প্রকল্পকে ভূপদার্থবিদ্যার আলোকে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করতে উইলসন যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন তা এক কথায় যুগান্তকারী। তিনিই প্রথম বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ওয়েগেণারের মহীসঞ্চরণ প্রকল্পের উপর ভিত্তি করেই সমুদ্রতলের প্রসারণ প্রকল্প ও প্লেট টেক্‌টণিকস্ তত্বের ভূপদার্থ-বিষয়ক জটিলতা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাই ওয়েগেণারের কাজকে উইলসন 'ওয়েগেণারীয় বিপ্লব' (Wegenarian revolution) আক্ষা দিয়েছিলেন।

কানাডার টোরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে ১৯৬৩তে উইলসন পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন যে মধ্য-আটলান্টিয় শৈলশিরার (Mid Atlantic Ridge) উভয় পার্শ্বে সমকোণে অবস্থিত অগ্ন্যুৎপাত জাত দ্বীপ সমূহের বয়স ঐ শৈলশিরা থেকে যত দূরে, তত বেশী। উইলসন

বুঝেছিলেন যে এই বিষয়টি সম্ভব হয়েছে মধ্য-আটলান্টিয় শৈলশিরার সাপেক্ষে আটলান্টিক মহাসাগরের প্রসারণের কারণে। উইলসনের এই বক্তব্যই পরে সমুদ্রতলের প্রসারণ প্রকল্পের পক্ষে একটি অকাট্য যুক্তির কাজ করেছে। এরপর ১৯৬৫-তে প্লেট টেক্‌টণিকস্ তত্বকেও সাধারণ সূত্রাকারে প্রথম প্রকাশ করার কৃতিত্বও উইলসনেরই। তিনিই প্রথম মহাসাগরীয় ভূত্বকে মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরা, পরিবর্তী চ্যুতি ও অধোগামী প্লেটের বলয়ের (subduction zone of a plate) মধ্যে একটি অখণ্ড সম্পর্কের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর তিন বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৮তে ডাব্লু জে মর্গান (W.J. Morgan) প্লেটগুলির জ্যামিতিক মাত্রা বা পরিসর নির্ধারণ করে প্লেট টেক্‌টণিকস্ তত্বকে আরো সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন।

প্রারম্ভে পরিবর্তী চ্যুতিগুলিকে (transform faults) মধ্যমহাসাগরীয় শৈল শিরার মধ্যবর্তী স্খলনতল (offset) হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও উইলসনই প্রথম বললেন যে পরিবর্তী চ্যুতিরা আসলে প্রসারণ অক্ষের (spreading axis) মধ্যবর্তী স্খলনতল। যার ফলে ঐ প্রসারণ অক্ষের সাপেক্ষে এই পরিবর্তী চ্যুতিগুলির দুটি অংশে গতির পরিবর্তন ঘটে থাকে (চিত্র-২২)।
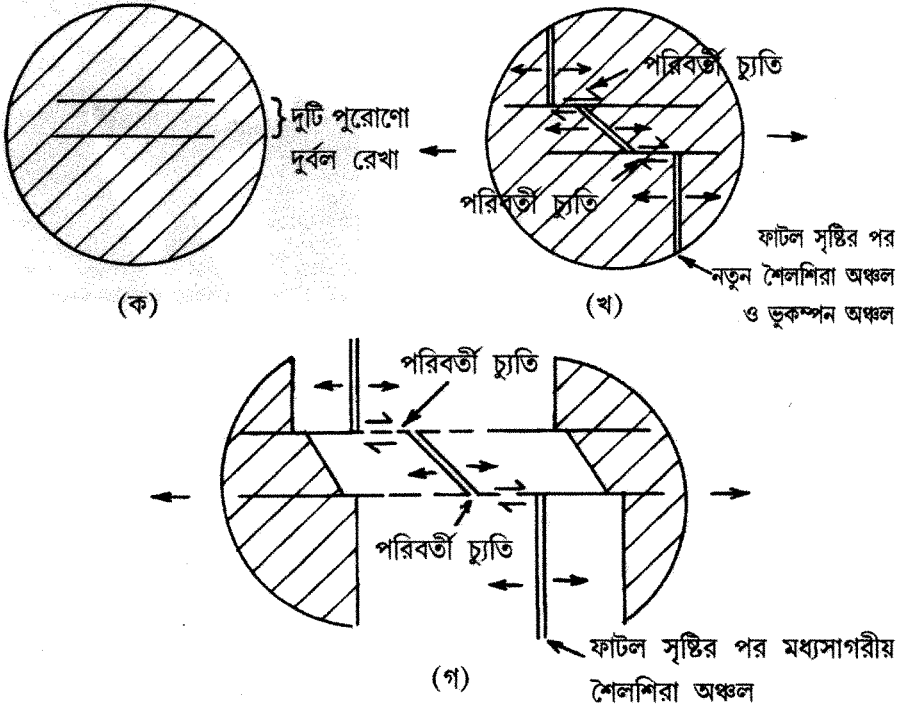
চিত্র-২২ তিনটি পর্যায়ে মধ্যসাগরীয় শিরা তৈরির সঙ্গে একটি মহাদেশের দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়া দেখানো হয়েছে। ফাটল সৃষ্টির সঙ্গে পরবর্তী চ্যুতিরা যুক্ত আছে। ফাটল অঞ্চল বা শিরা অঞ্চলগুলি ভূকম্প প্রবণ (জে. টি. উইলসন ১৯৬৫) চিত্র, কেনেট ১৯৮২ থেকে নেওয়া।

মহাসাগরীয় ত্বকে অবস্থিত দ্বীপমালার নির্দিষ্ট ভাবে একই দিকে একটি বলয়ের আকারে সুসজ্জিত থাকার বিষয়ও উইল্‌সন লক্ষ্য করেছিলেন। তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে ঐসব আগ্নেয় দ্বীপগুলি ম্যান্টেলের (mantle) মধ্যে অবস্থিত কোন স্থির তপ্ত অঞ্চল বা hotspot থেকে সৃষ্টি হয়। এদের ধারক প্লেটটির সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট দিকে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দ্বীপগুলিও ঐ দিকেই সারিবদ্ধ ভাবে অবস্থান করতে থাকে (চিত্র-২৩)।
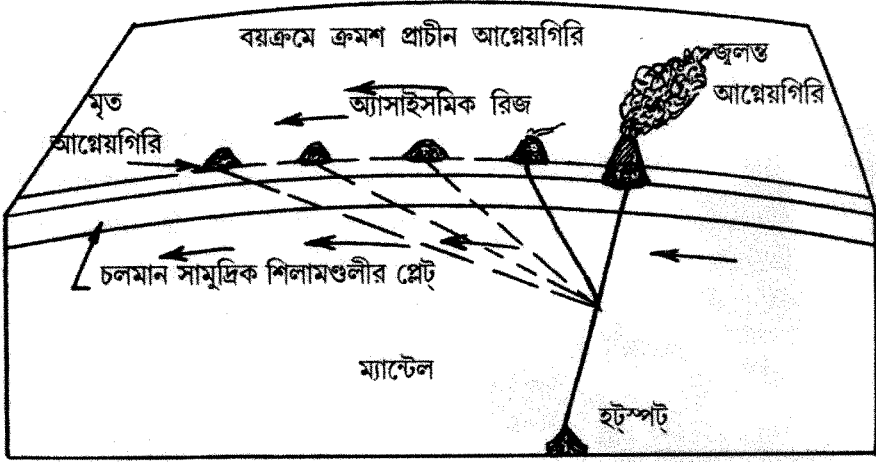
চিত্র-২৩ হট্‌স্পট্ থেকে সৃষ্টি হওয়া আগ্নেয়গিরি বলয় যারা প্রাচীনতম থেকে নবীনতম বয়ক্রমে সজ্জিত। অ্যাসাইস্‌মিক রিজ্ বা ভূকম্পনহীন শিরাগুলির এই ভাবেই সৃষ্টি হয়।

উইলসন, ডিউয়ে ও বার্ড (Wilson, Dewey and Bird) ১৯৭০-এ বললেন যে সাগর ও মহাসাগরগুলিরও জীবনচক্র (life cycle) আছে। তাই এদের জীবনাবর্তে ভ্রুণ (embryo), তরুণ (young), পরিণত (mature), পড়ন্ত (declining), ও প্রান্তিক (terminal) অবস্থাগুলিকেও অতি সহজে লক্ষ্য করা যায়। আজকের পৃথিবীতে 'রেড সি' যেখানে ভ্রুণাবস্থার সাগর, ভারত ও আন্টলান্টিক মহাসাগর সেখানে পরিণত আর প্রশান্ত মহাসাগর পড়ন্ত। সাগর সৃষ্টির প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে মহাসাগরের সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার এই জীবনচক্রকে উইলসনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'উইলসন চক্র' হিসাবে নামাকরণ করা হয়েছে। (এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য পরিচ্ছেদ ১৮ দ্রষ্টব্য)

পরিচ্ছেদ-১০

এইচ্ এইচ্ হেস্ ও সমুদ্রতল প্রসারণ প্রকল্প

উইলসনের গবেষণার উপর নির্ভর করে ও ওয়েগেণারের মহীসঞ্চরণ প্রকল্পকে কাজে লাগিয়ে ১৯৬২-তে এইচ্ এইচ্ হেস (চিত্র-২৪) (H.H. Hess) উদ্ভাবণ করলেন তাঁর সমুদ্রতল প্রসারণ প্রকল্প (Sea floor spreading hypothesis)। ১৯৬২ তে প্রকাশিত তাঁর গবেষণা পত্র 'হিস্ট্রি অফ্ দি ওশেন বেসিন' (History of the Occan Basin) ভূবিদ্যায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এরপর ১৯৭৬-রে মহীসঞ্চরণ প্রকল্প ও সমুদ্রতলের প্রসারণ প্রকল্পকে একত্রিত করে প্লেট টেক্টণিক্স তত্ত্বের সৃষ্টি যা আজকের পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ও ভূভৌত সংক্রান্ত বহু বিষয় ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে। মহাদেশের সীমানায় অবস্থিত ভাঁজ পর্বতের (fold mountain) সৃষ্টি থেকে শুরু করে মহাসাগরীয় ভূত্বকের সীমানায় মহাসাগরীয় ভূখাতের (oceanic trench) সৃষ্টি রহস্য, অগ্ন্যুৎপাত জাত দ্বীপমালার সৃষ্টি রহস্য, আগ্নেয়গিরি ও ভূকম্পনের সৃষ্টি ও তাদের অবস্থানগত সর্ম্পক, মধ্য-মহাসাগরীয় শৈল শিরার সৃষ্টি ও অবস্থান ও অবশেযে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলির পারস্পারিক স্থান পরিবর্তনের বিষয়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে প্লেট্ টেক্টণিকস্ তত্ত্বের প্রয়োগে।
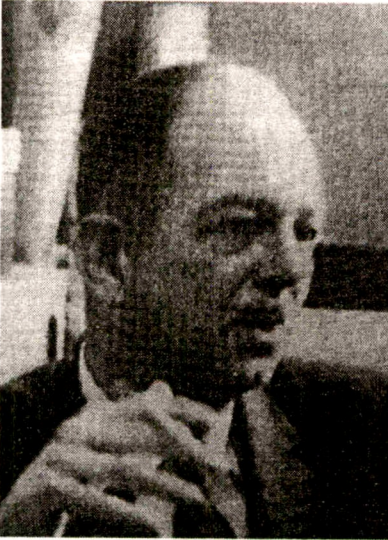
চিত্র-২৪: হ্যারি এইচ্ হেস্

নৌসেনা অফিসার হিসাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় হেস্ যুদ্ধ জাহাজ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের এক অংশে প্রতিধ্বনিরেখক যন্ত্রের (echo sounder) সাহায্যে সমুদ্রতলের গভীরতাসূচক (bathymetric) প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। ঐ সব তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি মহাসাগরের তলদেশে প্রচুর সমতল শীর্ষের আগ্নেয়গিরির সন্ধান পান। হেস্ এদের নামাকরণ করেন 'গিয়ট' (guyot)। সমুদ্রত্বকের বিভিন্ন আগ্নেয়গিরি ও পললের বয়ক্রমের তারতম্য, মধ্যমহাসাগরীয় শৈল শিরা থেকে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমান্বয়ে এদের বয়ঃবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ের

পর্যবেক্ষণ থেকে স্থির সিদ্ধান্তে এসে, হেস্ ১৯৬২ তে তাঁর সমুদ্রতল প্রসারণ প্রকল্পকে শক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

গভীর সমুদ্রখাতের (oceanic trench) মহাকর্ষ বৈষম্য (gravity anomaly) বিষয়ে তাঁর ও এফ্ এ ভেনিং মেনেজ-এর (FA Vening Meinesz) গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে সমুদ্রখাতগুলি প্রকৃতপক্ষে ম্যান্টেলের মধ্যে অবস্থিত তাপ সঞ্চালন স্রোত আবর্তের (convection current cell) নিম্নগামী অঞ্চলের বহিঃপ্রকাশ। নৌসেনা অফিসারের কর্মজীবনে হেস্ মহাসাগরীয় ত্বকে অবস্থিত প্রচুর সমতল চূড়া সম্পন্ন আগ্নেয়গিরির (guyots বা flat-topped seamounts) অবস্থান মানচিত্র তৈরি করেন। গবেষণা লব্ধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ হেস্ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মধ্যমহাসাগরীয় শৈলশিরা বরাবর নতুন সমুদ্রের সৃষ্টি হয় আর পূর্বতন সমুদ্রত্বক ধীরে ধীরে ঐ অঞ্চল থেকে দূরে সরে গিয়ে মহাসাগরের সীমানা বরাবর গভীরখাতে বিলিন হতে থাকে (চিত্র-২৫)। মনে রাখা দরকার সমুদ্রতল-প্রসারণ প্রকল্পের স্রষ্টা হিসাবে হেস্ পরিচিত হলেও ১৯৬১-তেই বিজ্ঞানী আর ডেট্ (চিত্র-৩৫) (R. Dietz) তাঁর প্রবন্ধে 'সমুদ্রতল প্রসারণ' কথাটির উল্লেখ করেছিলেন।
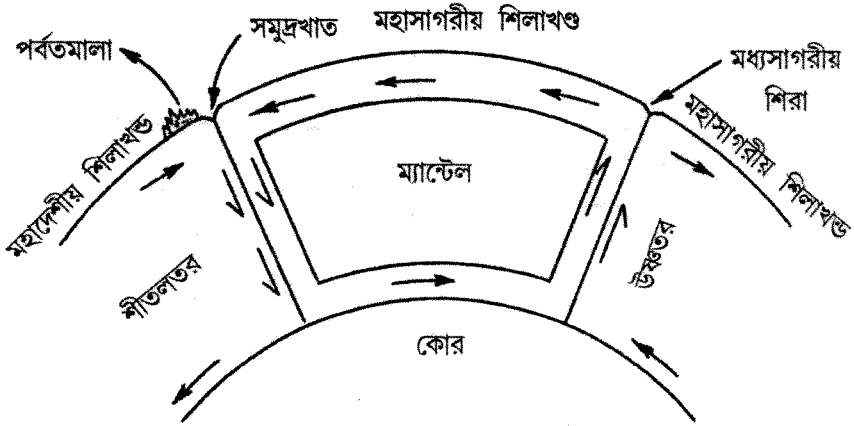
চিত্র-২৫ এইচ্ এইচ্ হেসের ধারণায় সমুদ্রতলের প্রসারণ প্রক্রিয়া

সমুদ্রতলের প্রসারণ ছাড়াও সমুদ্র-ত্বকে অবস্থানরত সমতলীয় চূড়া সম্পন্ন ভল্কানিক্ বা উদ্গারী শিরাগুলির উপর তাঁর গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হেস্-ই প্রথম বলেছিলেন যে এইসব অগ্ন্যুৎপাত জাত শিরারা সময়ের সঙ্গে মহাসাগরীয় ত্বকে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হতে থাকে ও ঢেউয়ের প্রভাবে এদের অনেকের চূড়াই সমতলে পরিণত হয়। সমুদ্রতলে সৃষ্টি হয় গিয়ট্ বা টেবল্ পর্বত (table mount) (চিত্র-২৬ক) । উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের সমুদ্রে ঐ সব টেবল্ পর্বতকে আশ্রয় করে আবার সৃষ্টি হয় নানান ধরণের প্রবাল দ্বীপ (চিত্র-২৬খ)।
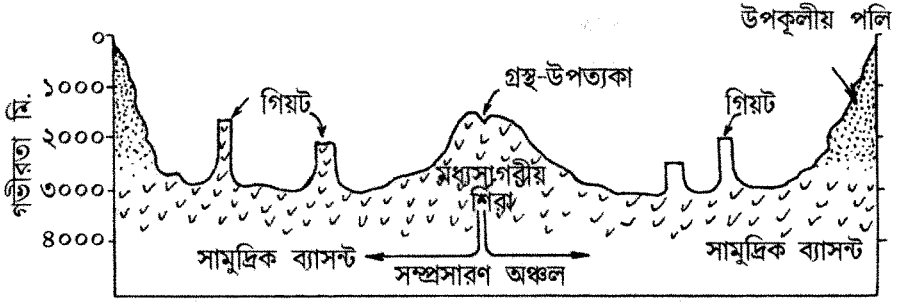
চিত্র-২৬ (ক) মধ্যসাগরীয় শিরা ও গিয়টের অবস্থান
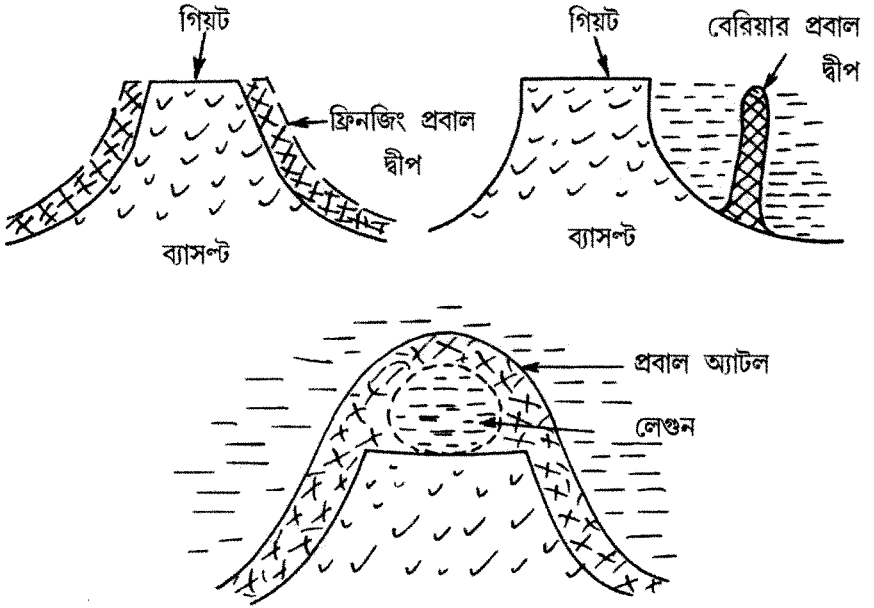
(খ) গিয়ট বা টেবল্ পর্বতকে আশ্রয় করে তিন ধরণের প্রবাল দ্বীপের সৃষ্টি ও অবস্থান।

সামুদ্রিক চৌম্বকত্ব ও ফ্রেড ভাইন-ডি এইচ ম্যাথিউস্ প্রকল্প

সামুদ্রিক চৌম্বকত্ব-এর (marine magnetics) উপর ব্যাপক গবেষণার সূত্রপাত ১৯৫০ সালে। ক্যালিফোর্নিয়ার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের ভূচৌম্বকত্বের উপর গবেষণায় দেখা গেলো যে ঐ অঞ্চলে সমুদ্রতল উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পরপর কতগুলি চৌম্বক বৈষম্য (magnetic anomaly) দিয়ে তৈরি। প্রশ্ন হচ্ছে, কী এই চৌম্বক বৈষম্য? এর উত্তরে জানা গেলো যে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের (Geomagnetic field) গড় শক্তির (intensity) থেকে বিচ্যুতি ঘটলে চৌম্বক বৈষম্যের সৃষ্টি হয় আর এই বৈষম্যের মান ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে। যেখানে ভূচৌম্বক ক্ষেত্র গড় শক্তির থেকে অধীক শক্তির মান প্রদর্শন করে

সেখানে চৌম্বক বৈষম্য ধনাত্মক (positive anomaly) আর যেখানে এই শক্তি গড় শক্তির কম সেখানে চৌম্বক বৈষম্য ঋণাত্মক (negative anomaly)।

এরপর আইসল্যান্ডের দক্ষিণে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে রেক্‌জেনস্ শিরা (Reykjanes Ridge) পরীক্ষা করে সেখানকার প্রতিসমভাবে (symmetrically) সাজানো চৌম্বক বৈষম্যগুলিকে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়। মধ্য আটলান্টিক শিরার চূড়ায় অবস্থিত চৌম্বক বৈষম্যকে বৈষম্য সংখ্যা ১ (Anomaly Number 1) হিসাবে চিহ্নিত করে এর সাপেক্ষে দুদিকে অবস্থিত দুটি প্রশস্ত ধনাত্মক বৈষম্যের রেখায়ন বা ডোরাকে (stripe) বৈষম্য সংখ্যা ৫ (Anomaly Number 5) হিসাবে চিহ্নিত করা হয় (চিত্র-২৭ক)।
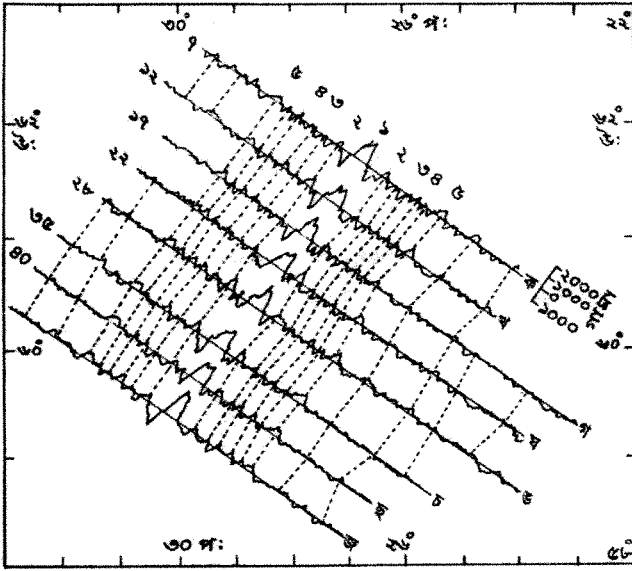
চিত্র-২৭(ক) রেকজেনস্ শিরায় চৌম্বক বৈষম্য ১ থেকে ৫ বৈষম্য নম্বরে দেখানো হয়েছে। ক থেকে জ ৮টি পার্শ্বচিত্র (profile)। চৌম্বক বৈষম্যের সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। ১, ৩ ও ৫ ধনাত্মক, ২ ও ৪ ঋণাত্মক চৌম্বক বৈষম্য। ১ নম্বরটি শিরার অক্ষকে নির্দেশ করছে। (সি. কে. শের্ফাট ও এল. এ. সারকিণ ১৯৭৩ থেকে সংকলিত)।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত মহাসমুদ্রের ত্বকের চৌম্বক মানচিত্র (magnetic map) তৈরি করার সময় আশ্চর্যজনক ভাবে দেখা গেলো যে ব্যাসল্ট শিলায় তৈরি সমুদ্রত্বক পরস্পর সমান্তরাল চৌম্বক রেখায়ন (magnetic lineation) বা ডোরা দিয়ে সাজান। সমুদ্রত্বকের চৌম্বকত্বের এই বৈশিষ্ট্যটি জানার পরও বহু বছর পর্যন্ত এদের সৃষ্টির কারণ অজানাই থেকে যায়। ১৯৬৩ সালে এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভাইন (Vine) ও ম্যাথিউস্ (Matthews) বললেন যে সমুদ্রতলের এই রৈখিক চৌম্বক বৈষম্য সৃষ্টির পিছনে ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের

পর্যায়ক্রমিক (periodic) বিপরীতীকরণ (reversal) জড়িত। সামুদ্রিক চৌম্বকত্বের বিষয়ে তাদের প্রকল্পে তাঁরা সমুদ্রতল প্রসারণ (sea floor spreading) ও ভূচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের বিপরীতীকরণকে (geomagnetic field reversals) সংযোজিত করে একটি সহজ ও সর্বজন গ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন।

ভাইন ও ম্যাথিউস লক্ষ্য করেছিলেন যে মধ্যসাগরীয় শৈলশিরা বরাবর উদ্‌গিরীত লাভার কঠিনিভবনের ফলে নতুন সমুদ্রত্বকের সৃষ্টি হতে থাকে। এরপর এই লাভাস্তর ঠান্ডা হতে হতে কুরী বিন্দুর (curie point) নিচে নেমে এলে এদের মধ্যে লৌহ চৌম্বকত্ব (ferromagnetic) গুণ চলে আসে। কঠিন লাভা তখন চুম্বক ধর্ম পেয়ে পারস্পারিক ভূচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের অভিমুখী হতে থাকে। সমুদ্রত্বক গঠনের প্রক্রিয়া চলতে থাকায় মধ্যসাগরীয় শৈলশিরা বরাবর সৃষ্টি হওয়া পূর্বতন সমুদ্রের ত্বক ঐ শৈলশিরার সাপেক্ষে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শৈলশিরার দুদিকে ক্রমশ সরে যেতে থাকে। নতুন সামুদ্রিক ত্বক সৃষ্টির সঙ্গে ভূচৌম্বক ক্ষেত্রে মেরুর বিপরীতীকরণ ঘটলে, শৈলশিরার দুপাশের ত্বক শিরা অক্ষের সমান্তরালে কতগুলি লম্বা ব্লকে বা ডোরায় সজ্জিত হয়। এই ব্লকগুলি তখন স্বাভাবিক (normal) বা বিপরীতধর্মী (reversed) চৌম্বকত্ব নিয়ে সামুদ্রিক চৌম্বকত্বের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

সামুদ্রিক চৌম্বকত্বের দিক পরীক্ষা করে দেখা যায় যে পাশাপাশি সাজানো লাভাস্তরগুলিতে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চৌম্বকত্ব বর্তমান (চিত্র-২৭খ)। উদ্‌গারী শিলা (Volcanic rocks) সমূহের বয়স নির্ণয় করে দেখা যায় যে ৬ লক্ষ ৯০ হাজার বছরের কম বয়সের শিলায় চৌম্বক অক্ষের উত্তর-দিক সন্ধানী মেরু (North seeking Pole) ভূচৌম্বকত্বের উত্তর মেরুর (Magnetic North Pole) দিক নির্দেশ করে। এই শিলাসমূহ স্বাভাবিক মেরু (Normal polarity) সম্পন্ন। এদের সৃষ্টির সময় পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র আজকের সময়ের ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের অনুরূপ ছিল। আবার যে শিলাসমূহের বয়স ৬ লক্ষ ৯০ হাজার থেকে ৮ লক্ষ ৯০ হাজার বছরের মধ্যে তাদের চৌম্বকত্বের দিক ছিল বর্তমান
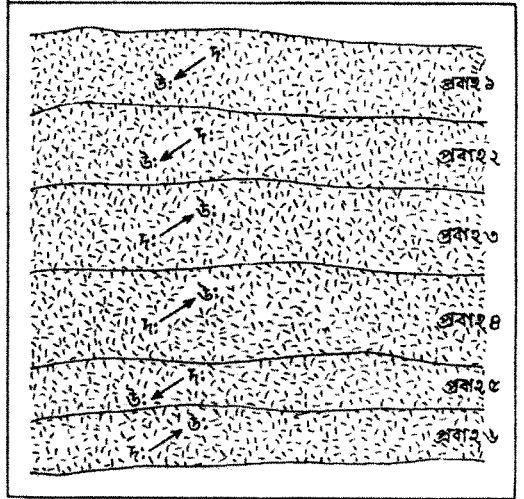
চিত্র-২৭(খ) লাভা স্রোতে চৌম্বকত্বের দিক দেখানো হয়েছে। লাভা স্রোত ৩,৪, ও ৬ স্বাভাবিক চৌম্বকত্ব ও লাভা স্রোত ১,২ ও ৫ বিপরীতধর্মী চৌম্বকত্ব প্রদর্শন করছে। (সি.কে. শের্ফাট ও এল. এ. সারকিন, ১৯৭৩ থেকে সংগৃহীত)।

সময়ের বিপরীতে অর্থাৎ তখন মেরু বিপরীত ধর্মী বা ব্যুৎক্রমী ছিল আর তারা তৈরি হয়েছিল এমন একটি সময় ধরে যখন পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র আজকের সময়ের বিপরীতে থাকার ফলে কম্পাসের উত্তর দিকদর্শক কাঁটা ছিল দক্ষিণ দিক দর্শকাভিমুখী।

ভাইন ও ম্যাথিউস্ বলেছিলেন যে সমুদ্রত্বকের চৌম্বক বৈষম্য সৃষ্টির পিছনে যে বিষয়টি কাজ করছে তা হলো মধ্যসাগরীয় শৈল শিরা থেকে উদ্‌গিরীত লাভার স্বাভাবিক ও বিপরীত ভূচৌম্বকীয় মেরু কালমাত্রার (geomagnetic polarity time scale) সঙ্গে শৈলশিরা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়ার ফল। এর ফলেই শৈলশিরার উভয় দিকে পালাক্রমে অবস্থিত স্বাভাবিক ও বিপরীত চৌম্বকত্বের ব্লকগুলি সমুদ্রত্বকে সাজানো থাকে। স্বাভাবিক চৌম্বকত্বের লাভাস্তর ধনাত্মক ও বিপরীত চৌম্বকত্বের লাভাস্তর ঋণাত্মক চৌম্বক বৈষম্য দেখায় কারণ প্রথম ক্ষেত্রে শিলার চৌম্বকত্বের সঙ্গে পৃথিবীর Core এর চৌম্বকত্ব যোগ হয় আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিলার চৌম্বকত্ব পৃথিবীর চৌম্বকত্বের শক্তিকে কিছুটা কমিয়ে রাখে।

ভাইন ও ম্যাথিউসের প্রকল্প সমুদ্রতল প্রসারণ (sea floor spreading) তত্ত্বের পক্ষে একটি জোড়ালো যুক্তি হিসাবে গণ্য হয়েছে। ১৯৬৫-তে ভাইন ও জে টি উইলসন প্রশান্ত মহাসাগরের Juan de Fuca শিরায় চৌম্বক বৈষম্যের নমুনা পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে এখানেও ভাইন ও ম্যাথিউসের প্রকল্প সমানভাবেই প্রযোজ্য। এই দুই বিজ্ঞানী ধনাত্মক চৌম্বক বৈষম্য নম্বর-১কে Brunhes Normal Polarity time scale-এর সঙ্গে ও এর সংলগ্ন ঋণাত্মক চৌম্বক বৈষম্য নম্বর-২কে Matuyama Reverse Polarity time scale-এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। পরে অন্যান্য ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চৌম্বক বৈষম্যগুলির নামাকরণ হয়েছে (চিত্র-২৭গ)।
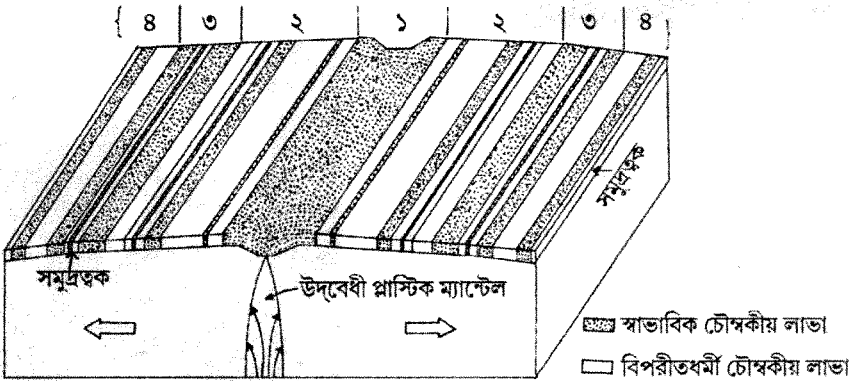
চিত্র-২৭(গ) বিভিন্ন নামের চৌম্বকীয় লাভাস্তর বিভিন্ন ভূচৌম্বকীয় মেরু কালক্রমকে নির্দেশ করছে। ভাইন ও ম্যাথিউস্ প্রকল্প অনুসারে মধ্য সাগরীয় শৈল-শিরার সাপেক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে সাজানো স্বাভাবিক ও ব্যুৎক্রমী চৌম্বকীয় লাভাস্তরকে দেখানো হয়েছে (সি.কে. শের্ফাট ও এল.এ. সারকিন, ১৯৭৩ থেকে পরিবর্তিত)।

পরিচ্ছেদ-১১

স্যার ই সি বুলার্ড ও এম্ ইউইং-এর ভূভৌত বিষয়ক গবেষণা

স্যার ই.সি. বুলার্ডের (চিত্র-২৮) (১৯০৭-১৯৮০) (E.C. Bullard) গবেষণা পৃথিবীর গভীরের বহু তথ্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। ব্রিটেনের এই ভূপদার্থ বিজ্ঞানীর গবেষণার পরিধি ছিল বিশাল। ১৯৪০-৫০ দশকে আমেরিকার ভূপদার্থ বিজ্ঞানী ডাব্লু এম্ এলসাসে (W.M. Elsasser) ও বুলার্ড পৃথিবীর চৌম্বকত্বের রহস্য নিয়ে সর্বপ্রথম গবেষণা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে পৃথিবী একটি বৃহৎ তড়িচ্চুম্বক (electromagnet) যার চৌম্বকত্বের জন্য পৃথিবীর অভ্যন্তরে একটি dynamo শক্তি কাজ করছে। যদিও বুলার্ডের উপস্থাপিত পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টির কারণ এই সমস্যার সম্পূর্ণ নিরসন করতে পারেনি তবুও তাঁর 'Dynamo theory'-ই এখনো পর্যন্ত সমধীক স্বীকৃত একটি তত্ত্ব। এরপর বুলার্ড ও তার সহকর্মীরা ১৯৬০-এর দশকে ওয়েগেনারের মহী সঞ্চরণ প্রকল্প নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। আটলান্টিক মহাসাগরের সীমানায় অবস্থিত মহাদেশগুলির সঞ্চরণ পর্ব শুরুর আগের অবস্থার সন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা ঐসব মহাদেশগুলির সীমানার মধ্যে পারস্পারিক একটি অসাধারণ জ্যামিতিক মিল (geometric fit) Computer programme-এর মাধ্যামে নির্ধারণ করতে সক্ষম হন। এর ফলে 'মহী সঞ্চরণ প্রকল্পের' বাস্তবতাও অনেক সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বুলার্ড আরো প্রমাণ করেছিলেন যে ইউরোপ, আফ্রিকা, দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা প্রমুখ প্লেটগুলি

চিত্র-২৮: ই.সি. বুলার্ডের

চিত্র-২৯: মরিস্ ইউইং

সঞ্চরণ (drifting) ও 'মেরু সঞ্চারের' (Polar wandering) মাধ্যমে আটলান্টিক মহাসাগরের সীমানার বর্তমান রূপরেখা তৈরি করেছে।

বুলার্ডের প্রায় সমসাময়িক এম্ ইউইং (চিত্র-২৯) (১৯০৩-১৯৭০) (M. Ewing) ও তাঁর সহকর্মীদের সামুদ্রিক ভূভৌতবিদ্যার (Oceanic geophysics) গবেষণা প্লেট টেক্টনিকস্ তত্ত্বকে আরো শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিল। ইউইং নিজে সমুদ্রতল প্রসারণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ না করলেও, তাঁর অসামান্য গবেষণা থেকেই আমরা মহাদেশগুলির সীমানার প্রকৃতি ও মহাসাগরের সান্নিধ্যে তাদের গঠন সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পেয়েছি। ইউইং ও তাঁর ছাত্ররা সেই সময় সমুদ্রের গভীরতা মাপার একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন যার সাহায্যে মহাসাগরের বিভিন্ন স্থানের গভীরতা অত্যন্ত নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব হয়েছিল। তাঁরাই প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন যে গভীর সমুদ্রের তলদেশে কোথাও কোথাও বিস্ময়কর ভাবে সমতল অঞ্চল আছে যা এতো মসৃণ যে একটি "বিলিয়ার্ড টেবল্"-এর মসৃণতাকেও হার মানায়। এই অঞ্চলগুলিকে পরে 'অ্যাবিসাল্ প্লেন' বা গভীর সমুদ্র তলের সমভূমি হিসাবে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন স্থানে চিহ্নিত করা হয়। এইসব মসৃণ অঞ্চলের অবস্থিতির কারণ সম্বন্ধে তাদের ধারণা হয়েছিল যে গভীর সমুদ্র ত্বকে প্রচুর পরিমান পলির সরবরাহ হয় মহাদেশীয় অঞ্চল থেকে যারা পঙ্কিল স্রোতের (turbidity current) প্রবাহ হিসাবে সমুদ্রতলের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত থাকে। বালি (sand) ও সিল্ট (silt) জাতীয় ছোট-ছোট পলল দানার আধিক্যের জন্যই গভীর সমুদ্রের সমভূমিগুলি এত সমৃণ।

ই ইরভিং-এর মেরু সঞ্চার ও এস্ কে রানবর্ণের ভূ-ভৌত বিষয়ক গবেষণা

১৯২৭-এ ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারে ইরভিং-এর জন্ম। ইংল্যান্ড, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা পর্যন্ত তাঁর কাজের বিস্তৃতি। বর্তমানে কানাডার ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের (Canadian Geological Survey) এমারিটাস্ অধ্যাপক। সুদীর্ঘ ৫০ বছরের উপর ইরভিং বিভিন্ন মহাদেশের অক্ষাংশের পরিবর্তন, পুরাচৌম্বকত্ব ও মেরুসঞ্চারের উপর গবেষণা করেছেন।

১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি ভূচৌম্বকত্ব (geomagnetic) ও মেরু সঞ্চার (Polar wandering) বিষয়ে গবেষণায় ই ইরভিং ও এস্ কে রানকর্ণ (E. Irving & S.K. Runcorn) আবার ওয়েগেণারের মহী সঞ্চরণ প্রকল্পকে আলোচনায় ফিরিয়ে আনলেন। ওয়েগেণারের মহী সঞ্চরণ-এর টেকটণিক্স ব্যাখ্যায় পুরাচৌম্বকত্ব (palaeomagnetism) যে ভাবে সাহায্য করেছে, বিজ্ঞানের অন্য কোন ধারায় তা সম্ভব হয়নি। পুরাচৌম্বকত্বের প্রথম মূল্যবান ব্যবহার আমরা পেলাম মেরুসঞ্চার ও মহী সঞ্চরণ প্রকল্পের ব্যাখ্যায়। বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের শিলার পুরাচৌম্বকত্ব মেপে প্রাচীনকালের মহাদেশগুলির চৌম্বক মেরুসমূহের অবস্থানের পুর্নগঠন সম্ভব হয়েছে। ১৯৬৫তে অষ্ট্রেলিয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (Australian National University) অধ্যাপক পদে থাকাকালীন ইরভিং পুরাচৌম্বকত্বের উপর সংগৃহীত তথ্য থেকে উত্তর আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার পুরাঅক্ষাংশ (Palaeolatitude) নির্ণয় করতে

পেরেছিলেন। পুরাচৌম্বকত্ব ব্যবহার করে ইরভিং উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের মেরু পথ (pole path) হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে উত্তর আমেরিকার মেরু পথ ইউরোপের মেরু পথের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

১৯৭৯-তে ইরভিং রয়াল সোসাইটি অফ্ লন্ডনের ফেলো নির্বাচিত হন। ২০০৩-এ কানাডা সরকার তাঁকে 'অর্ডার অফ্ কানাডা' উপাধিতে ভূষিত করে। জীবনের প্রথম পর্বে ইরভিং ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের (Geological Survey of India) প্রেরিত শিলার উপর গবেষণা করে গন্ডোয়ানাল্যান্ড বিভাজনের পর থেকে ভারতের মেরু সঞ্চারের দিক ও পরিমানের নিখুঁত হিসাব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ Mining Geological Society তাঁকে Gondwana Gold Medal দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

চিত্র-৩০: স্ট্যান্‌লে কে রাণকর্ণ

পদার্থবিদ্যার ব্রিটিশ অধ্যাপক রাণকর্ণ (চিত্র-৩০) সমুদ্রতল প্রসারণ ও প্লেট টেকটণিকস্ মডেল সৃষ্টির বহু আগেই মহী সঞ্চরণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে ইনি মহাদেশগুলির অনুবাহ প্রক্রিয়ার ভূভৌত বিষয়ক গবেষণায় বিশেষভাবে আগ্রহী হন। মহাসাগরীয় ত্বকের চৌম্বকত্ব ও গভীর সমুদ্র ছিদ্রন (deep sea drilling) থেকে পাওয়া তথ্যের দ্বারা তিনি ওয়েগেণারের মহাদেশীয় সঞ্চরণ প্রকল্পের পক্ষে প্রভূত ভূভৌততাত্ত্বিক (geophysical) সমর্থন পেয়েছিলেন যা ওয়েগেণার তাঁরই তৈরি প্রকল্পে সেই সময় ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

রাণকর্ণের কাজের মধ্যে দিয়ে প্লেট টেকটণিকস্ তত্ত্বের বহু কঠিন প্রশ্নের সমাধান সম্ভব হয়েছে। রাণকর্ণ বলেছিলেন যে মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরা থেকে ক্রমশ সরে গিয়ে নবীন মহাসাগরীয় ত্বক বছরে ১ থেকে ১০ সেমি বেগে অধোগামী হয়ে প্রান্তীয় গভীরখাতের (marginal trench) মধ্যে দিয়ে ম্যান্টেলে প্রবেশ করে। এর ফলে ম্যান্টেলের উচ্চতর তাপে অধোগামী প্লেটের অগ্রবর্তী অংশ তপ্ত হতে থাকে। ৭০০ কিমি গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছনোর মধ্যে উপরের পললস্তর (sedimentary layer) সমেত এই সামুদ্রিক প্লেট গলিত হয়ে আগ্নেয়গিরি বলয়ের (volcanic arc) সৃষ্টি করে। তিনি দেখালেন অগ্ন্যুদ্‌গিরণ জাত প্রান্তীয় দ্বীপ বলয়ের (marginal island arc) লাভার সংযুতি (composition) মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরা থেকে উদ্‌গিরীত লাভার সংযুতি থেকে অনেক আলাদা।

সমুদ্রত্বকে ভূতাত্ত্বিক ও ভূভৌতবিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সময় রাণকর্ণ এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে মহাসাগরীয় ত্বকের উপর পাললিক শিলার বা পললের বেধ

(thickness) মহাদেশীয় অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম, মাত্র কয়েক শ মিটার। ভূতাত্ত্বিক বয়সের নিরিখে মহাদেশগুলি অনেক অল্প সময়ের জন্য জলে আচ্ছাদিত থাকা সত্ত্বেও মহাদেশীয় অঞ্চলে পাললিক শিলাস্তরের বেধ অনেক বেশী। এই সব বিষয় পর্যবেক্ষণের পর রাণকর্ণ সিদ্ধান্তে আসেন যে মহাসাগরের বয়স প্রকৃতপক্ষে অনেক কম যা পৃথিবীর সামগ্রিক বয়সের প্রায় ২ শতাংশ। সুতরাং খুব বেশী পলল সঞ্চয়নের উপযুক্ত বয়স মহাসাগরগুলির এখনো হয়নি। দ্বিতীয়ত মহাসাগরের ত্বকে সঞ্চিত পললস্তর অনবরতই প্রান্তীয় গভীর খাতে প্রবেশ করে মহাদেশগুলির প্রান্তীয় অঞ্চলে সংযোজিত হচ্ছে।

রাণকর্ণের কাজ এক কথায় যুগান্তকারী। যে সব বিষয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন, সেই সব বিষয়গুলিই পরবর্তী সময়ে মহী সঞ্চরণ, সমুদ্রতল প্রসারণ ও পরে প্লেট টেকটনিক্সের ভিত্তিভূমিকে শক্ত করতে প্রভূত সাহায্য করেছে।

বি.সি. হিজেন্ ও তাঁর মহাসাগরের গভীরতা সংক্রান্ত মানচিত্র

মরিস্ ইউইং ও তাঁর অন্যতম ছাত্র ও সহকর্মী ব্রুস্ সি. হিজেন্ (চিত্র-৩১) (Bruce C. Heezen) 'ভেমা' (Vema) নামক গবেষণা জাহাজে ১৯৫৫-তে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে বৈজ্ঞানীক সমীক্ষা চালান। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন 'লামন্ট ভূতাত্ত্বিক মানমন্দিরে' থাকাকালীন ইউইং নানা প্রকার যন্ত্রপাতি এবং 'ভেমা' জাহাজটি ক্রয় করেছিলেন সমুদ্রতলের নানা বিষয়ের গবেষণার সুবিধার জন্য। পরে এগুলির সহায়তায় ভূকম্পন প্রতিফলন (Seismic reflection) প্রযুক্তি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ব্রুস হিজেনের আটলান্টিক অভিযানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন এম্ টল্ওয়ানি (M. Talwani)। হিজেনের উদ্দেশ্য ছিল গভীর সমুদ্রতলের সমভূমি (abyssal plain) অঞ্চলগুলির সীমানা নির্ধারণ করা ও প্রমাণ করা যে এইসব সমতলগুলি পঙ্কিল প্রবাহের (turbidity current) সঙ্গে বাহিত বালি ও সিল্ট মাপের কর্করীয় দানায় আচ্ছাদিত বলেই এত মসৃণ। হিজেন তাঁর গবেষণায় এইসব ধারণার যথার্থ্যতাও প্রমাণ করেছিলেন। ইনি আরো দেখেছিলেন যে গ্রস্থ উপত্যাকার (rift valley) প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে ভ্রূণ (embryonic) অবস্থা পেরিয়ে সাগর মহাসাগরের পরিণত (mature) ও বার্দ্ধক্য প্রাপ্তির (old) জীবনক্রম চলতে থাকে। সমুদ্রতলের বিস্তৃতি বা প্লেট্ টেকটাণিকসের স্রষ্টা না হলেও হিজেনের গবেষণা এই দুটি অসাধারণ প্রকল্পের সৃষ্টির পথে আলোকপাতে প্রভূত সাহায্য করেছে। ইউইং ও হিজেনের গবেষণা থেকেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে মধ্য-

চিত্র-৩১: ব্রুস্ সি. হিজেন্

মহাসাগরীয় শৈলশিরা ও তাদের অন্তর্বর্তী মধ্যসাগরীয় গ্রস্থাঞ্চল (mid-oceanic rift) এক মহাসাগর থেকে অন্য মহাসাগর পর্যন্ত সংযুক্ত। এই সব পর্যবেক্ষণের পরেই হিজেন গভীর সমুদ্রের মানচিত্র তৈরিতে মনোনিবেশ করেন।

১৯৬০-৬৫-তে হিজেন ও মেরী থার্প (Marie Tharp) সমুদ্রতলের ভূপ্রাকৃতিক (physiographic) মানচিত্র তৈরি করেন (চিত্র-৩২)। মহাসাগরীয় এইসব মানচিত্রে এঁরা
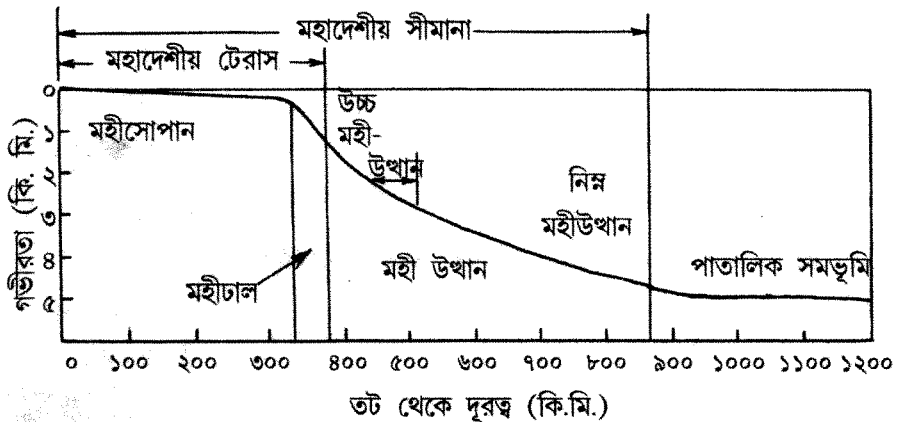
চিত্র-৩২ মহাদেশীয় সীমানার প্রধান বৈশিষ্ট্য পূর্ণ অঞ্চল (হিজেন, থার্প ও ইউয়িং ১৯৫৬ থেকে পরিবর্তিত)।

মহাসাগরীয় ত্বকের টেকটনিক্ গঠন থেকে গভীর সমুদ্রে পলি সঞ্চয়ণের নমুনা বিষয়ক বহু তথ্য পরিবেশন করেন। এঁদের তৈরি আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের গভীরতা সংক্রান্ত (bathymetric) মানচিত্র এক অনন্যসাধারণ সম্পদ। এছাড়া ১৯৬০-এ ইউয়িং ও হিজেন মধ্য আটলান্টিক শৈল শিরার পার্শ্বচ্ছেদের সবিস্তার একটি চিত্রও উপস্থাপন করেন (চিত্র-৩৩)। ১৯৭১-এ প্রকাশিত বি.সি. হিজেন ও সি.ডি. হলিষ্টারের (C.D. Hollister) 'দি ফেস্
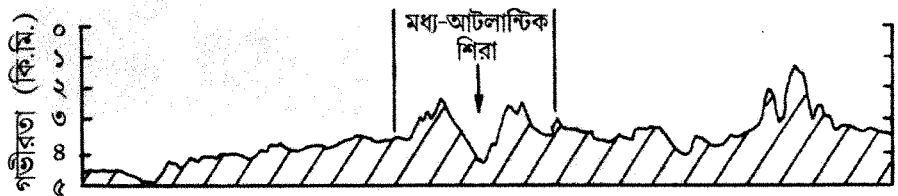
চিত্র-৩৩ মধ্য আটলন্টিক শিরার পার্শ্বচ্ছেদ (এম ইউয়িং ও বি. হিজেন ১৯৬০ অনুসারে)

অফ্ দি ডিপ্' (The face of the deep) গ্রন্থে মহাসাগরের তলদেশের আকৃতি ও তার তারতম্যের বিশদ বর্ণনা আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯৭৭-এর ২১শে জুন ব্রুস্ হিজেন উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যসাগরীয় শৈলশিরা 'রেক্জেনস্ শিরায়' (Reykjanes Ridge) গভীর সমুদ্রে কাজ করার সময় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মাত্র ৫০ বছর বয়সে প্রাণ হারাণ।

পরিচ্ছেদ-১২

সমুদ্র পৃষ্ঠের ওঠা-নামা ও আর ডাব্লু ফেয়ারব্রিজ

ভূতাত্ত্বিক সময় ধরে সমুদ্রপৃষ্ঠের ওঠা-নামা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বড় ভূমিকা নিয়েছে আর এই বিষয়ে গবেষণার পথিকৃৎ বিজ্ঞানী আর ডাব্লু ফেয়ারব্রিজ (চিত্র-৩৪) (R.W. Fairbridge)। ১৯১৪-তে অস্ট্রেলিয়ার পিনজারাতে (Pinjarra) জন্মগ্রহণ করে ফেয়ারব্রিজ অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও কানাডায় পড়াশুনা শেষ করে নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। সমুদ্র বিজ্ঞানের গবেষণা ছাড়াও ভূবিদ্যা, পুরাতত্ত্ব ও পুরাজলবায়ুর বিষয়ে ফেয়ারব্রিজের গবেষণা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। পুরাজলবায়ুর উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ফেয়ারব্রিজ ''মহী সঞ্চরণ প্রকল্প''-এর বাস্তবতার বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন যা ১৯৬০এর দশকের শেষে ভূবিজ্ঞানে একটি দৃঢ় প্রকল্প হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

চিত্র-৩৪: রোড্‌স্ ডাব্লু ফেরারব্রিজ

১৯৬০-৬১ সালে ফেয়ায়ব্রিজ সমুদ্রতলের ওঠানামার উপর "The changing level of the sea" ও "Eustatic changes in the sea level" নামে দুটি অসাধারণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে সমুদ্রতলের ওঠা-নামার সম্ভাব্য সব কারণ ব্যাখ্যা করা ছাড়াও ফেয়ারব্রিজ ভূতাত্ত্বিক সময়ের সঙ্গে এই পরিবর্তনের হার নির্ণয় করেছিলেন। ১৯৬৬-তে তাঁর "The Encyclopedia of Oceanography : Encyclopedia of Earth Science Series-এর এক নম্বর ভল্যুম প্রকাশিত হয়। এই সব প্রবন্ধে ও পুস্তকে Quaternary সময়ের অর্থাৎ আজ থেকে ১৭ লক্ষ বছর আগে সমুদ্র পৃষ্ঠের ওঠা-নামার উপরে তাঁর মতামত প্রকাশ পায়। ফেয়ারব্রিজ হিসাব করে দেখালেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপীয় উপকূলে যখন বছরে ১.১ মি.মি হারে সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হচ্ছিল, ঠিক তখনই উত্তর আমেরিকায় এর হার ছিল বছরে ৩ মি.মি। ফেয়ারব্রিজ বললেন যে টেক্‌টণিক্ বা আকস্মিক হিমবাহের গলনে সমুদ্রপৃষ্ঠ কখনও খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে পারে, যেমন ১৮৭৫ থেকে ১৮৭৭-র মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ ৭০ মি.মি হারে উঁচু হয়েছিল।

সমুদ্র পৃষ্ঠের ওঠা-নামা ও উপকূলীয় অঞ্চলের গবেষণায় প্রথমে জে আর কুরে (J.R. Currey) ১৯৬৫-তে ও তারপরে ১৯৬৮ তে জে ডি মিলিম্যান (J.D. Milliman) ও

কে ও এমারি (K.O. Emery) অসাধারণ কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন। মিলিম্যান ও এমারির মতে Late Quaternary সময়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের অবস্থান ছিল বর্তমান সময়ের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২০-১৩০ মিটার নিচে। আমেরিকার আটলান্টিক উপকূলের ও মেক্সিকো উপসাগরের মহীসোপানের তথ্য সংগ্রহ করে এরা দেখেছিলেন যে আজ থেকে ৩৫০০০-২৫০০০ বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠ বর্তমান সময়ের সমুদ্র পৃষ্ঠের কাছাকাছি ছিল। এরপর মহাদেশীয় অঞ্চলে পূর্ণ হিমযুগের শুরুতে সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্রম অবনমন হতে থাকে। ফলে আজ থেকে ২০,০০০-১৫০০০ বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠ, ১২০-১৩০ মিটার গভীরতায় স্থির হয়। যদিও বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের এই ওঠা-নামার হিসাবে অনেক তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে।

পরবর্তী ২০০০ বছরে (১৫০০০-১৩০০০ বছর আগে) সামুদ্রিক আগ্রাসন (marine transgression) শুরু হওয়ায় প্রথম বছরে প্রায় ৪ মি.মি হারে সমুদ্র পৃষ্ঠ উঁচু হতে থাকে ও আজ থেকে ৭০০০ বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠ ১০০ মিটারের বেশী উঁচু হয়ে যায়। এই সময় সমুদ্রপৃষ্ঠ আজকের সময়ের অবস্থানের তুলনায় প্রায় ১০ মিটার নিচে ছিল।

এরপর ১৯৬৯-এর একটি গবেষণা পত্রে এমারি, এর পরবর্তী পর্যায়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উঠে আসার বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে আজ থেকে ৭০০০ বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠ অত্যন্ত ধীর গতিতে বছরে প্রায় ১.৪ মি.মি হারে উঁচু হতে থাকে এবং আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠের এই তল আজকের সময়ের অবস্থান থেকে ৫ মিটারের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। পরবর্তী ২০০০-৪০০০ বছরের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হয়ে এখনকার সমুদ্রপৃষ্ঠকে ছুঁয়ে ফেলে।

এমারি ও এল্ ই গ্যারিসন (L.E. Garrison) ১৯৬৭ তে Science জার্ণালে তাঁদের প্রবন্ধ "Sea Levels 7000-2000 years age" প্রকাশ করেন। মহীসোপানে মগ্ন সৈকতের নিদর্শন সহ, অধুনা অবলুপ্ত অতিকায় হাতি ম্যাস্টোডনের দাঁত, নিমজ্জিত পিটের (peat) স্তর ও লেগুণ (lagoon) অঞ্চলের ঝিনুক ও শামুক জাতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করে ঐ বিজ্ঞান পত্রিকায় এরা লিখলেন যে বিগত শেষ হিমযুগে সমুদ্রপৃষ্ঠ বর্তমান সময় থেকে ১০০ মিটার বা তার কাছাকাছি কোন গভীরতায় বিরাজমান ছিল।

এরপর বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফিনল্যান্ডের মহিলা সমুদ্র বিজ্ঞানী ইউগি লিসিট্জিন (Eugie Lisitzin) আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও তাদের সন্নিহিত অঞ্চলের মোট ২২৮টি স্থান থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের (sea level) ওঠা-নামা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ্ করেন। এরই ফল স্বরূপ ১৯৭৪-এ তাঁর বিখ্যাত বই "Sea Level Changes" প্রকাশিত হয় যা সেই সময় পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর লেখা একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। হেলসিঙ্কির Institute of Marine Research-এর এই বিজ্ঞানী ফেনোস্কান্ডিয়া উপ-মহাদেশের দ্রুত উঠে আসা ও বাল্টিক সাগরপৃষ্ঠের অদ্ভুত আচরণের বিষয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের ওঠা-নামার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে এই বিষয়ে গবেষণার জন্য আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন।

পরিচ্ছেদ-১৩

মহীসোপান থেকে গভীর সমুদ্রের বিবিধ বিষয়ের গবেষক কেনেথ ওরিস্ এমারি

মহাসমুদ্রের বিস্তৃত অঞ্চলের গবেষণায় সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানী কেনেথ ওরিস্ এমরি (চিত্র-৩৫) (১৯১৪-১৯৯৮) (Kenneth Orris Emery) ছিলেন একজন পথিকৃৎ। ১৯১৪ সালের ৬ই জুন কানাডার Swift Current, Sas katchewan-এ তাঁর জন্ম। এমারি আর এক পথিকৃৎ সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞনী এফ্ পি শেপার্ডের উৎসাহ ও সহযোগীতায় আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের সমুদ্রের গভীরতা, গঠন, সমুদ্রতলের পলল, শিলা, ফস্ফোরাইট ও সামুদ্রিক কাদার উপর গবেষণা করে ১৯৪১-এ Illinois বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ঐ সময়ে তাঁর সহকর্মী ছিলেন আর এস্ ডেট্ (R.S. Deit)। এমারি ও ডেট তাঁদের গবেষণায় সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানের বহু নতুন দিগন্ত খুলে দেন যা পরবর্তী প্রজন্মের সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানীদের গবেষণার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।
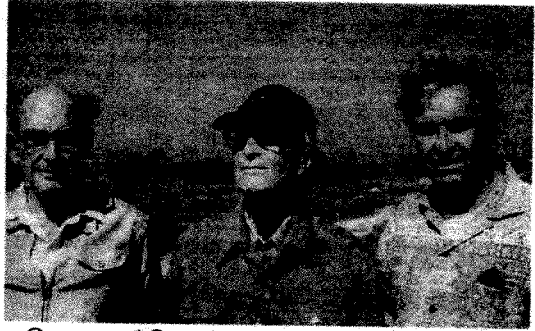
চিত্র-৩৫: বাঁদিক থেকে কে ও এমারি, ফ্রানসিস্ পি শেপার্ড ও আর এস ডেট

বর্তমান সময়ের মহীসোপানের পলল পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এরা আধুনিক সময়ের পরিবেশে তৈরি নিকটবর্তী তটের (nearshore) পলল ও আধুনিক সময়ের পরিবেশের সঙ্গে অসমাঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ পূর্বতন 'relict' পললের সমাহারে তৈরি। Relict পললগুলি পূর্বতন সময়ে তাদের সৃষ্টির পরিবেশ ও ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে। ১৯৬৮-তে এমারি দেখালেন যে বর্তমান পৃথিবীর মহীসোপানগুলির সামগ্রিক পললের প্রায় ৭০ শতাংশই relict পললে তৈরি।

১৯৭০-এ এমারি ও তাঁর সহকর্মী মহাসাগরের হাজারো বিস্ময়ের মধ্যে আর একটি বিস্ময়ের সন্ধান পান। এরা সমুদ্রের তলদেশের চৌম্বকীয় শান্ত অঞ্চল (magnetic quiet zone)। এদের সৃষ্টির প্রকৃত কারণ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এমারি আটলান্টিক মহাসাগরের সীমানা ধরে চৌম্বকীয় শান্ত অঞ্চলের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছিলেন।

এরপর এদের সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি তিনটি সম্ভাব্য কারণও ব্যাখ্যা করেছিলেন : (ক) শিলার রূপান্তরের (metamorphism) দ্বারা এদের চৌম্বক লক্ষণের বিলুপ্তি, (খ) গ্রস্থ উপত্যকা জাত সমুদ্র সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে দুর্বল পুরাচৌম্বকীয় নথি ও (গ) নিম্ন চৌম্বকীয় অক্ষাংশের সমুদ্রত্বকে চৌম্বক লক্ষণ হ্রাস।

১৯৭২-এ এমারি আমেরিকার ভূতাত্বিক সর্বেক্ষণের সমুদ্র বিজ্ঞানী ই উচুপীকে (E. Uchupi) সঙ্গে নিয়ে কানাডার পূর্ব উপকূল থেকে মেকিসকো উপসাগর পর্যন্ত ১০,০০০ কি.মি লম্বা উপকূলীয় অঞ্চল জরীপ করে সেখানকার একটি মানচিত্র তৈরি করেন। এই মানচিত্রে তারা উত্তর আটলান্টিকের পশ্চিম উপকূলের ভূসংস্থান (topography), শিলা, গঠন, জল, প্রাণী ও পললের প্রকৃতি ও বিন্যাসের বিষদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এরপর এমারি Palaeozoic পরবর্তী সময়ে (অর্থাৎ আজ থেকে ২৪ কোটি বছর আগের) মহাসমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে অবক্ষেপিত পললের পরিমান নির্ধারণ বিষয়ে গবেষণা চালান। তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেলো যে যদিও সমুদ্রের মহীঢাল ও মহীউত্থান (continental rise) সম্বিলিতভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠের মাত্র ১০ শতাংশ জায়গা জুড়ে আছে তথাপিও সমুদ্রতলের সামগ্রিক পললের প্রায় ৭০ শতাংশ পরিমান পললই এই দুই অঞ্চলেই অবক্ষেপিত হয়।

১৯৭৩-এ শেপার্ড ও এমারি একটি গবেষণা পত্রে মহীখাতের উপর পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশ করেন। এতে জানা গেলো যে মহীখাতগুলি সাধারণত নদীর মোহানা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে মহীসোপান অঞ্চল থেকে সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ এরা কঙ্গো, কলম্বিয়া, হাডসন ও রোণ প্রভৃতি নদীর ক্ষেত্রে মহীখাতগুলির অবস্থান ব্যাখ্যা করেন (চিত্র-৩৬ক)। একই ভাবে
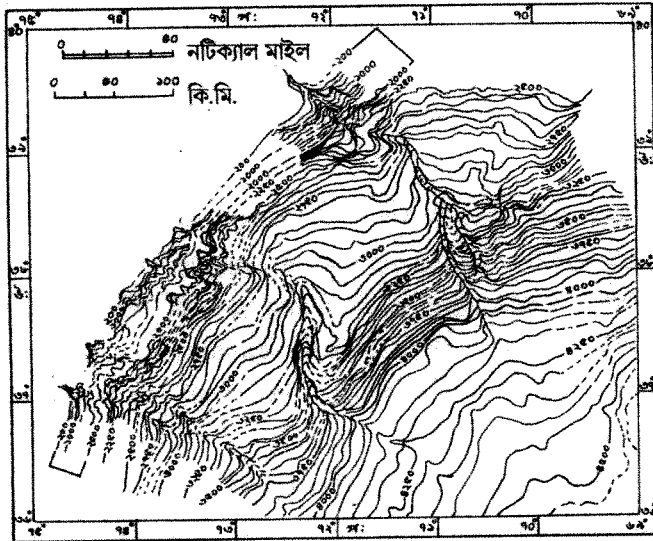
চিত্র ৩৬(ক) পূর্ব আমেরিকার উপকূলে মহীসোপান ও মহীঢালের গভীরতা সূচক মানচিত্র। মহীউত্থানকে কেটে মহীখাতগুলির বিস্তৃতি দেখানো হয়েছে (জেমস্ কেনেট, ১৯৮২ থেকে গৃহীত)

মহীখাতগুলি বৃহৎ নদীর মগ্ন ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে সূত্রপাত হয়ে সমুদ্র গভীরে ধাবিত হয়। এই প্রসঙ্গে এরা গঙ্গা, সিন্দু ও মিসিসিপির সম্মুখস্থ মহীখাতগুলির উদাহরণের অবতারণা করেন। মহীখাতের পললের উৎস ও পলল চলনের প্রক্রিয়ার উপর এমারি ও উঁচুপীর গবেষণা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

এরপর ১৯৭৭-এ এমারির গভীর সমুদ্রের সমতলে (abyssal plain) বৃহৎ নদীবাহিত পলল অধক্ষেপণ থেকে তৈরি হওয়া শঙ্কু আকৃতির পলল গঠনগুলির ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। আটলান্টিকে ৭টি প্রধান পলল-শঙ্কুর অবস্থান পরীক্ষা করে এমারি দেখালেন যে এরা সেন্ট লরেন্স, হাডসন, মিসিসিপি, আমাজন, অরেঞ্জ, কঙ্গো ও নাইজার নদী বাহিত পললে তৈরি এবং 'অ্যাবিসাল কোন' বা deep sea fan নামে পরিচিত।

গভীর সমুদ্রের তলদেশে খনিজ সঞ্চয়নের উপর আকৃষ্ট হয়ে ১৯৭৭-এ এমারি তাঁর সমকর্মী বি জে স্কিনারের (B.J. Skinner) সঙ্গে মহাসাগরীয় ত্বকের authigenic পললের (যারা সমুদ্রতলে নিজের অবস্থানেই সৃষ্টি হয়) উপর গবেষণা চালান। এই গবেষণায় দেখা গেলো যে ধাতু সমৃদ্ধ পলির সঙ্গে লৌহ (Iron) অক্সাইডের বিরাট সম্ভার মহাসাগরীয় ত্বকে বিদ্যমান। এমারি ও স্কিনার দেখালেন যে লৌহ সমৃদ্ধ পলল দ্রুত প্রসারিত শৈলশিরা অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত। Iron sulphide সমৃদ্ধ পলল মাঝারি হারে প্রসারিত শৈলশিরার সঙ্গে ও ম্যাঙ্গানিজ সমৃদ্ধ পলল ধীরে প্রসারিত শৈলশিরা অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া জানা গেলো যে গভীর সমুদ্রের অক্সিজেন হীন (anoxic) অঞ্চলে বেশীর ভাগ ধাতু হাইড্রোজেন সালফাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে পলিতে উজ্জ্বল রং-এর metallic sulphide তৈরি করে যাতে তামা, দস্তা, রূপা, সিসা, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ জাতীয় ধাতুর সমাহার ঘটে।

১৯৮০-তে এমারি পৃথিবী ব্যাপী অভিসারী, অপসারি ও স্থানান্তরী সীমানাগুলির বিস্তার বিষয়ে একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন (চিত্র-৩৬খ)। প্লেট টেকটনিক্স-এর আলোতে বিশ্লেষিত এমারির এই কাজ মহাদেশীয় ও দ্বীপমালার সীমানাগুলিকে নির্দিষ্টভাবে চিনতে সাহায্য করেছে। মহাদেশীয় সীমানার ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে এমারি অভিসারী (convergent), অপসারী (divergent) ও স্থানান্তরী (strike-slip) পর্যায় হিসাবে তিন ভাগে ভাগ করেন। ঐ বছরই এমারি মহাদেশের সীমানায় তিন ধরণের পলল বাঁধের (sediment dam) অস্তিত্ব চিহ্নিত করে একটি অসাধারণ মানচিত্র প্রকাশ করেন। তাঁর মতে এই পলল বাঁধগুলি (ক) টেকটনিক্, (খ) কোরাল-অ্যালগি, বা (গ) ডায়পির (diapir) গোত্রের হতে পারে। এমারির তৈরি মহাদেশীয় উত্থান অঞ্চলের ও মহাসাগরীয় খাতের মানচিত্র সামুদ্রিক ভূবিদ্যায় একটি অমূল্য সম্পদ।

এমারির প্রায় সমসাময়িক কালে ১৯৭২-এ, এ পি লিসিটজিন্ (A.P. Lisitzin) সামুদ্রিক পললের গঠনে অগ্ন্যুৎপাত-জাত পললের ভূমিকার বিষয়ে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে উত্তর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের ২৫ থেকে ৭৫
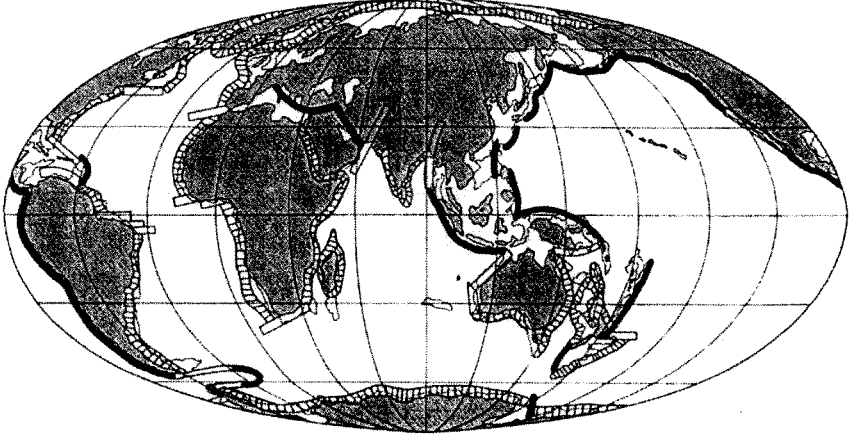
চিত্র-৩৬(খ) পৃথিবীব্যাপী মহাদেশীয় সীমানায় অভিসারী, অপসারি ও স্থানান্তরী বা ট্রান্স্লেশন প্রকৃতির কিনারার বন্টন দেখানো হয়েছে। (কে ও এমারি, ১৯৮০ থেকে গৃহীত)।

শতাংশ কর্করীয় অবক্ষেপ আবহাওয়া মণ্ডল থেকে অধক্ষেপণের ফলে সৃষ্টি হয়। অগ্ন্যুৎপাত জাত সামুদ্রিক পলল প্রধানত তিন ধরণের: (ক) পাইরোক্লাস্টিক (pyroclastic) অবক্ষেপ যা আগ্নেয় শিলাখন্ড সম্বলিত পলল। (খ) এপিক্লাস্টিক্ (epiclastic) অবক্ষেপ যা পুরণো শিলাখন্ড অবক্ষেপ বা সমুদ্রের গভীরে সৃষ্টি হওয়া অগ্ন্যুৎপাত-জাত পদার্থের ক্ষয়িভবনের ফলে বাহিত পলল, ও (গ) অথিজেণিক (authigenic) অবক্ষেপ যা সমুদ্র গভীরের আগ্নেয়গিরি বা ঔদকতাপীয় ক্রিয়া (hydrothermal activity) অঞ্চলের নিকটবর্তী পলল।

লিসিট্জিন দেখিয়েছিলেন যে সামুদ্রিক পলল গঠনে অগ্ন্যুৎপাত-জাত পললের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত সামুদ্রিক দ্বীপমালা বলয়ের সন্নিহিত অঞ্চলে যেখানে দ্বীপমালার নিকটবর্তী ও সমান্তরাল পলল বলয়ের (sedimentary wedge) সৃষ্টিতে কয়েক হাজার মিটার পুরু অগ্ন্যুৎপাত জাত পলল সন্নিবিষ্ট থাকে। বায়ু বাহিত অগ্ন্যুৎপাত-জাত কনাগুলির অবক্ষেপকে বলা হয় টেফ্রা (tephra), গ্রীক ভাষায় যার অর্থ আগ্নেয় ভস্ম। যদিও ১৯৪৪-এ থোরারিণসন্ (Thorarinsson) শব্দটিকে আধুনিক ভূবিজ্ঞানে ব্যবহার করেছেন, ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই যে খ্রিস্টপূর্ব তিনশ শতকে অ্যারিস্টটল্ (Aristotle) ইটালীর আগ্নেয়গিরি-জাত আগ্নেয় ভস্মের অবক্ষেপকে টেফ্রা নামে অভিহিত করেছিলেন। প্রধাণত আঞ্চলিক অবক্ষেপ হলেও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০ কি.মি উঁচু) পর্যন্ত পৌঁছনো কনাগুলি অগ্ন্যুৎপাতের উৎস অঞ্চল থেকে ৩০০০-৬০০০ কিমি দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পরে। লিসিট্জিনের এই গবেষণা ১৯৭২-এ "Sedimentation in the World Ocean" নামক প্রবন্ধে আমেরিকার Society of Economic Palaeontologists & Mineralogists (SEPM) জার্নালের একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এ ই জে এনজেল ও তাঁর সামুদ্রিক ব্যাসল্টের বিশ্লেষণ

আমেরিকার স্যান্ ডিয়াগোতে প্রতিষ্ঠিত ক্যালিফের্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Scripts Institution of Oceanography-র ভূতত্বের অধ্যাপক এনজেল (চিত্র ৩৭) (A.E.J. Engel) ১৯১৬ তে মিসৌরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০-এর দশকে ইনি প্রথমে মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে প্রিন্সটন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। তাঁর জীবনের বহু গবেষণার কাজই এনজেল তাঁর স্ত্রী সেলেস্‌টি জি এনজেল (Celeste G. Engel)-এর সঙ্গে করেছেন। ১৯৬৪ তে ইনি গভীর সমুদ্রত্বকের শিলার নমুনা হাতে পেয়ে তাদের প্রকৃতি ও রাসায়নিক উপাদানের উপর গবেষণা শুরু করেন।
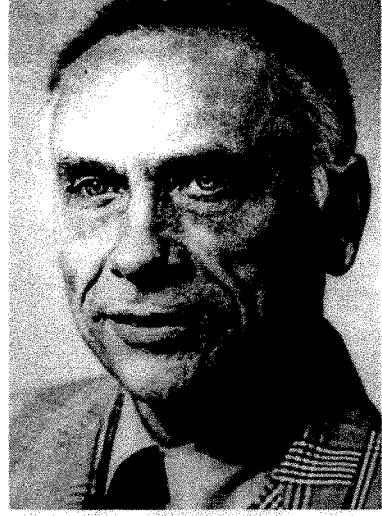
চিত্র-৩৭: অ্যালবার্ট ই জে এনজেল্

১৯৬৫ তে এনজেল্ গভীর সমুদ্রত্বক, দ্বীপমালা ও সমুদ্র পৃষ্ঠের নিচে ডুবে থাকা ঢিবি (seamounts) সমূহের ব্যাসল্টের রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখান। ঐ বছরেই প্রকাশিত তাঁর গবেষণা পত্র থেকে জানা গেলো যে সমুদ্র ত্বকের ব্যাসল্ট সামুদ্রিক থোলিয়াইট (oceanic tholeiite) জাতীয় এবং এরা দ্বীপমালা ও সামুদ্রিক ব্যাসল্ট ঢিবির উপাদান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এইসব অঞ্চলের ব্যাসল্ট প্রধাণত অ্যালকালি ব্যাসল্ট (alkali basalt) দিয়ে তৈরি। এনজেল এই দুই প্রধান গোষ্ঠির ব্যাসল্ট বিশেষণ করে তাদের রাসায়নিক উপাদানের পার্থক্য নির্ণয় করেন। এনজেল দেখালেন যে থোলিয়াইট ব্যাসল্ট যেখানে সিলিকা সম্পৃক্ত (silica saturated) সেখানে অ্যালকেলি ব্যাসল্টগুলি সিলিকা অসম্পৃক্ত (undersaturated with silica)। এছাড়া থোলিয়াইটের তুলনায় অ্যালকালি ব্যাসল্টে (Na_2o+K_2o)-র আধিক্য থাকে। খনিজ উপাদানের দিক দিয়েও এই দুই ধরণের ব্যাসল্টকে আলাদা করা সম্ভব। সাধারণভাবে সামুদ্রিক থোলিয়াইটে calcium poor pyroxene বা Quartz-এর প্রাধান্য থাকে। অ্যালকালি ব্যাসল্টে সেখানে calcium-rich titanaugite অথবা nepheline-এর প্রাধান্য দেখা যায়।

১৯৬৭-তে এনজেল দক্ষিণ আফ্রিকার পেরিডোটাইট্-এ (peridotite) পৃথিবীর আদিমতম সময়ে সমুদ্রতল প্রসারণের সুস্পষ্ট প্রমাণ আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর ভূতাত্বিক ইতিহাসের আরম্ভ থেকে ওয়েগেণারের প্যানজিয়ার অস্তিত্বকাল পর্যন্ত অর্থাৎ আজ থেকে ২৪ কোটি বছর আগের মহাদেশগুলির বিবর্তণের উপর এন্‌জেলের গবেষণা ঐ প্রাচীন সময়ের প্লেট্ টেকটণিকস্-এর উপর প্রভূত আলোকপাত করেছে।

প্যালিওজোয়িক পুরাভূসংস্থান ও এ.জি. স্মিথ্

পুরাভূসংস্থান (Palaeogeography) সংক্রান্ত গবেষণায় ব্রিটিশ ভূবিজ্ঞানী অ্যালান গিলবার্ট স্মিথ্ (চিত্র-৩৮) (Alan Gilbert Smith) পথিকৃৎ। ১৯৩৭-এ ইংল্যান্ডের ওয়াটফোল্ড (Watfold)-এ জন্ম। প্রথমে ক্যামব্রিজে পদার্থবিদ্যার শিক্ষা নিয়ে প্রিন্সটন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্বের পাঠ শেষ করেন। পরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জনস্ কলেজে ভূতত্ত্বের অধ্যাপক হন। সম্পূর্ণ মৌলিক গবেষণায় ওয়েগেণারের প্যানজিয়া গঠিত হওয়ার আগে অর্থাৎ প্যালিওজোয়িক (৫৭ কোটি থেকে ২৪ কোটি বছর আগে) সময়ে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা সহ মহাদেশগুলির অবস্থানকে পুর্নগঠন করাই ছিল স্মিয়ের গবেষণার শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

চিত্র-৩৮: অ্যালান গিলবার্ট স্মিথ্

প্যালিওজোয়িক সময়ে পৃথিবীর ভৌগোলিক মানচিত্র যে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল এই বিষয়ে ভূবিজ্ঞানীদের কোনও সংশয় ছিল না। স্মিথ ও তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানী ১৯৭৩-এ প্যালিওজোয়িক সময়ের জন্য পুরাভূসংস্থানের পুর্নগঠিত মানচিত্র প্রকাশ করেন। ভূবিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মিথের কাজটি একটি স্মরণীয় আবিষ্কার হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। পুরাচৌম্বকীয় তথ্য ও পুরাজলবায়ু (palaeoclimatic) তথ্যকে কমপিউটার প্রোগ্রামিং-এর সাহায্যে স্মিথ তাঁর মানচিত্রগুলি তৈরি করেন যা palaeozoic সময়ের ভূসংস্থান জানার জন্য একটি উৎকৃষ্ট দলিল হিসাবে আজও বিবেচিত হয়।

এরপর স্মিথ Palaeocene ও Eocene-এ (৬ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগের) সৃষ্টি হওয়া সমুদ্র বিষয়ক গবেষণায় ব্যাপৃত হন। ঐ সময় আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর সম্প্রসারণের ফলে প্রশান্ত মহাসাগর সংকুচিত হচ্ছিল। স্মিথ্ ও ব্রাইডেন্ (Smith and Briden) ১৯৭৭-এ তাদের গবেষণা পত্রে দেখালেন যে প্রশান্ত মহাসাগরের এশিয়ার দিকে ঘুর্ণনের ফলে ক্রিটেশিয়াস্-এর শেষ পাদে সুমেরু সাগরের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

পরিচ্ছেদ-১৪

সামুদ্রিক পলল পর্যায়ক্রমের নমুনা ও কুলেনবার্গ কোরার

গভীর সমুদ্রের পলল প্রকৃতির স্তর বিন্যাসের ও পুরাসমুদ্র-বিজ্ঞানের (palaeo-oceanography) বিকাশ সম্ভব হয়েছিল এই সব কাজের উপযোগী গবেষণা জাহাজ ও গভীর সমুদ্রের পলল নমুনা সংগ্রহের উপযুক্ত যন্ত্র-সামগ্রী উদ্ভাবনের মাধ্যমে। গভীর সমুদ্র ছেদন (deep sea drilling) প্রক্রিয়া ও কুলেনবার্গের (Kullenberg) পিষ্টন্ কোরার (piston corer) উদ্ভাবন এই কাজগুলিকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল।

১৮৭২-৭৬-এ চ্যালেঞ্জার অভিযানের বছরই গভীর সমুদ্রের পলল প্রকৃতি জানার প্রথম সুযোগ হয়। ১৮৯১-তে জন মুরে গভীর সমুদ্র ত্বকের পলল বিন্যাসের মানচিত্র তৈরি করলেও এতে পলল স্তরক্রমের কোন তথ্য ছিলনা কারণ তখনও সমুদ্রতল ছেদন প্রক্রিয়া বা Coring পদ্ধতি সমুদ্র বিজ্ঞানীদের করায়ত্ব হয়নি।

১৯৪৭-এ কুলেনবার্গের পিষ্টন কোরার উদ্ভাবিত হয়। এর সাহায্যে উত্তোলিত হয় Quaternary সময়ের সামুদ্রিক পললের পর্যায়ক্রম। এই সব কোর (Core) পরীক্ষা করেই আমরা পুরাজলবায়ু, পললবিদ্যা সহ সমুদ্রতলের উদ্‌গারী শিলার (Volcanic rocks) সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হয়েছি। ১৯৫০-এর দশকে একাধীক সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানী যথা এম্ ইউয়িং, এম্ হিজেন, ডি এরিকসন ও জি ওলিন পিষ্টন কোরার ব্যবহার করে সমুদ্রতলের পললের স্তরবিন্যাসের বিষদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

পিষ্টন কোরার ছাড়াও ইতিমধ্যে আরও অনেক রকমের কোরার উদ্ভারিত হয়। এর ফলে পললের পর্যায়ক্রম থেকে সামগ্রিক পলল স্তরের ও পাললিক শিলাস্তরের বয়স জানার কৌতুহলও বাড়তে থাকে।

১৯৪৬-এ আমেরিকার রসায়ন বিজ্ঞানী ডাব্লু এফ্ লিবি (W.F. Libby) 'কার্বন-১৪' প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন ও এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সমুদ্রত্বকের পললস্তরের আজ থেকে ৪০,০০০ বছর পর্যন্ত পুরোনো স্তরক্রমের বয়স নির্ধারণ করতে সক্ষম হন। পাললিক শিলার বা পললের বয়স নিরূপক 'কার্বন-১৪' প্রক্রিয়া উদ্ভাবণের জন্য লিবি ১৯৬০-এ নোবেল পুরস্কার পান। একই সঙ্গে আরও অনেক তেজস্ক্রিয় পদ্ধতির সাহায্যে সমুদ্রতলের পলল ও শিলাসমূহের বয়েস নিরূপনের কাজ চলতে থাকে। এরই মধ্যে অক্সিজেন আইসোটোপ্ স্তরবিদ্যা (Oxygen Isotope Stratigraphy) উদ্ভাবিত হয়। আমেরিকার মিয়ামি

বিশ্ববিদ্যালয়ের সি এমিলিয়ানি (C. Emiliani) Quaternary সময়ের পুরাজলবায়ুর ইতিহাস উদ্ঘাটনে প্রথম অক্সিজেন আইসোটোপ্ পদ্ধতি ব্যবহার করে এই বিষয়ে পথিকৃৎ বিজ্ঞানীর সম্মান লাভ করেন।

গভীর সমুদ্রতল ছিদ্রণ প্রকল্প ও গ্লোমার চ্যালেঞ্জার

১৯৫৭-৫৮ আর্ন্তজাতিক ভূভৌত বছরে (International Geophysical Year) পৃথিবীর ৩৭টি দেশের সহযোগিতায় মোট ৮০টি সমুদ্র গবেষণা জাহাজ গবেষণার কাজে ব্যাপৃত হয়। এরপর ১৯৭০-এর দশকটি চিহ্নিত হয় গভীর সমুদ্রতল ছিদ্রণ কার্যক্রমের (Deep sea Drilling Projects) দশক হিসাবে। এই কার্যক্রমই পরে মহাসাগর ছিদ্রণ কার্যক্রম (Ocean Drilling Programme) বা ও ডি পি নামে পরিচিত হয়। এই কার্যক্রমে সব চেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল গবেষণা জাহাজ গ্লোমার চ্যালেঞ্জার (Glomer Challenger) (চিত্র-৩৯)। ১২০ মিটার দীর্ঘ এই গবেষণা জাহাজ ১৯৬৮-৮৩ অর্থাৎ ১৬ বছর ধরে সমস্ত মহাসাগর পরিক্রমা করে সমুদ্রতলের বিভিন্ন স্থান থেকে পাললিক শিলার (sedimentary rocks) ও তার তলদেশের ব্যাসল্টের (Basalt) নমুনা সংগ্রহ করে। বিভিন্ন মহাসাগরের তলদেশে ৬২৪টি স্থানে ১০৯২-টি ছিদ্র (hole) করে শিলাস্তরের কোর (core) বা নমুনা সংগৃহীত হয়। এই অভিযানে আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল সহ মেকিসকো উপসাগরের তলদেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ হয়েছিল।
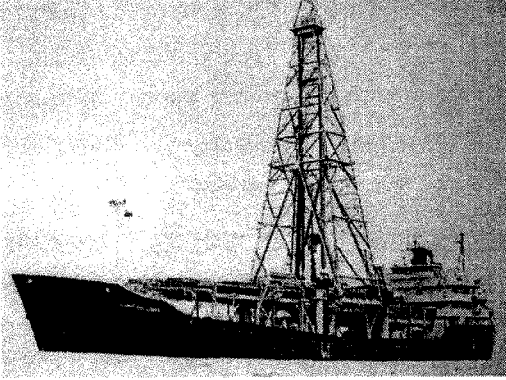
চিত্র-৩৯: গ্লোমার চ্যালেঞ্জার

প্রখ্যাত দুই ভূবিজ্ঞানী এফ্ পি শেপার্ড (১৮৯৭-১৯৮৫) (F.P. Shepard) ও জ্যাকিস্ বুকার্ট (চিত্র-৪০) (১৮৯১-১৯৬৫) (Jaques Bourcart) এই অভিযান শেষে মহাদেশের সীমানা, মহীসোপান, মহীঢাল ও মহীখাতের (canyon) গঠন ও ভূরূপ মানচিত্রের (morphological map) এক অসাধারণ বিবরণ প্রকাশ করেন।

চিত্র-৪০: জ্যাকিস বুকার্ট

শেপার্ডের সহকর্মী জ্যাকিস্ বুকার্ট প্রধাণত পললের সৃষ্টি ও গঠন প্রণালী নিয়ে গবেষণা করেন

ফ্রান্সের উপকূলীয় ভূমধ্যসাগরে। মহীঢাল ও মহীসোপান অঞ্চলের পলল সঞ্চয়নের বিবিধ প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে আমরা তাঁর গবেষণা থেকে জানতে পেরেছি। ১৯৪৮-এ প্রকাশিত শেপার্ডের গ্রন্থ 'সাব্‌মেরিণ জিওলজি'-তে (Submarine Geology) অগভীর থেকে গভীর সমুদ্রের গাঠনিক (structural) ও ভূরূপ (morphology) বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই রাশিয়ার সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানী এম বি ক্লেনোভা (M.B. Klenova) রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'জিওলজি অফ্ দি সি'ও (Geology of the Sea) প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য এর আগে রাশিয়ার দুই প্রখ্যাত ভূবিজ্ঞানী এন্ এল্ অ্যানড্রুসভ (১৮৬১-১৯২৪) (N.L. Andrusov) ও এন্ এম্ স্ট্র্যাচো (চিত্র-৪১) (১৯০০-১৯৭৮) (N.M. Strachow) যথাক্রমে কৃষ্ণ সাগরের জন্ম ইতিহাস ও পাললিক শিলার জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। স্ট্র্যাচো ও অ্যানড্রুসভের কৃষ্ণ সাগরের উপর ভূবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা তাদের সামুদ্রিক ভূবিদ্যায় পথিকৃৎ বিজ্ঞানীর সম্মান এনে দিয়েছিল।

চিত্র-৪১: এন এম্ স্ট্র্যাচো

জয়েড্‌স্ রেসোলিউশন : একটি অত্যাধুনিক গবেষণা জাহাজ

সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যতগুলি গবেষণা জাহাজ ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে বহুজাতীক বৈজ্ঞানীক সংস্থা 'জয়েন্ট ওসেনোগ্রাফিক্ ইন্সটিউট ফর্ ডিপ্ আর্থ স্যাম্প্লিং' (Joint Oceanographic Institute for Deep Earth Sampling) কর্তৃক পরিচালিত জাহাজ জোয়েড্‌স্ রেসোলিউশন (চিত্র-৪২) (Joides Resolution) অন্যতম প্রধান। অতি আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই জাহাজ দৈর্ঘে ১৪৩ মিটার যা তার পূর্বসূরি গ্লোমার চ্যালেঞ্জারের তুলনায় ২৩ মিটার বেশী দীর্ঘ। উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ও উত্তাল ঢেউয়ের সমুদ্রে জোয়েড্‌স্ অনায়াসে কাজ করতে পারে। মহাসাগরের তলদেশের প্রকৃতি, শিলার উপাদান, জীবাশ্ম ও পললের চরিত্র, সমুদ্রত্বকের গঠন সম্পর্কীয় বিষয় ছাড়াও বহু দুর্গম অঞ্চলের জটিল সমস্যা সমাধানে জোয়েড্‌সের তুলনা নেই।
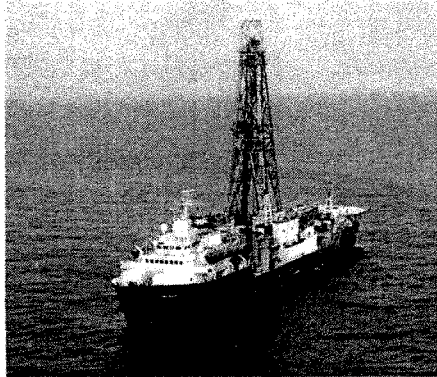
চিত্র-৪২: জয়েডস্ রেসোলিউশন

অতি আধুনিক গবেষণাগার সম্বলিত এই জাহাজটিতে সমুদ্রবিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌সহ মোট ৫০ জনের একটি দল অংশগ্রহণ করতে পারে। পৃথিবীর বহু সমুদ্র বিজ্ঞানীরা এই জাহাজে অংশগ্রহণ করে মহাসাগরীয় ত্বকের (Oceanic crust) বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। এই জাহাজে কাজ করার অভিজ্ঞতা যেমনি দুর্লভ তেমনি এর সাহায্যে লব্ধ গবেষণার তথ্য প্রায়শই সমুদ্রবিজ্ঞানে নতুন দিগন্তের দিশারী। এই জাহাজের ৬ নম্বর তলায় (Deck) সমুদ্র ত্বক ছিদ্রন (drilling) করে উত্তোলিত শিলার নমুনা বা কোর (core) গুলিকে সংগ্রহ করে রাখা হয়। পরে বিশ্লেষণের জন্য এইসব শিলার নমুনা অন্য কোন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গবেষণাগারে পাঠান হয়। তিন নম্বর তলা থেকে পাঁচ নম্বর তলার পাটাতনে আছে বিভিন্ন গবেষণাগার। টেক্‌সাসের এ এ্যান্ড এম্‌ বিশ্ববিদ্যালয় (A&M University) থেকে এর মহাসাগরীয় ত্বক ছিদ্রণের কর্মসূচীগুলি সংগঠিত হয়। গভীর মহাসাগরীয় ত্বক ছিদ্রনের মধ্যে দিয়ে বহু অজানা তথ্যের সন্ধান দিতে জোয়েড্‌স্‌ রেসোলিউশনের কোন জুড়ি নেই।

সম্প্রতি জাপান 'গড়জিলা মারু' (Godzilla Maru) নামে একটি অতিকায়, মহাসাগরীয় ত্বক ছিদ্রণের উপযোগী গবেষণা জাহাজ তৈরি করছে যার দৈর্ঘ জয়েড্‌স্‌ রেসোলিউশনের দেড়গুণ। সমদ্রতলকে আরো নিবিড়ভাবে জানতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পন্ন এই গবেষণা জাহাজ ভবিষ্যতে আরো অনেক বেশী সাহায্য করবে বলে সমুদ্রবিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

পরিচ্ছেদ-১৫

সমুদ্রবিজ্ঞান চর্চার গবেষণাগার

সামুদ্রিক গবেষণাগারের (Marine Laboratory) প্রয়োজন হয়েছিল বহু আগেই যখন বিভিন্ন সমুদ্র অভিযান থেকে সংগৃহীত বহু বিচিত্র সামুদ্রিক প্রাণীদের উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে মৃত বা পচনশীল অবস্থায় এদের নিয়ে আসা হতো সুদীর্ঘ অভিযানের শেষে। ফলে ঐ সব অমূল্য সংগ্রহগুলির জীবন্ত অবস্থায় চলাফেরা ও আচরণগত বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানা সম্ভব হতো না। এছাড়াও সংগৃহীত অপ্রাণী বা অজৈবিক পদার্থগুলির দ্রুত বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল সমুদ্রজলের ও আবহাওয়ার বিভিন্ন ভৌত রাসায়নিক (physico chemical) বৈশিষ্ট্যের মান নির্ধারণের জন্য।

তাই অভিযানে ব্রতী জাহাজেই পরিকাঠামো তৈরি করে বা সমুদ্র উপকূলেই কোন গবেষণাগার তৈরি করার বিষয় দানা বেঁধেছিল যাতে ঐ সব গবেষণাগারে প্রাকৃতিক পরিবেশে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌কে বাঁচিয়ে রেখে বা অক্ষত রেখে বহুদিন ধরে এদের বিষয়ে গবেষণার সুযোগ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ১৮২৬-এ প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ফরাসী দুই বিজ্ঞানী হেনরি মিল্‌নে এড্‌ওয়ার্ড (Henri Milne Edward) ও ভিকটর অ্যান্ডোইন্ (Victor Andouin)। এরাই প্রথম সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত প্রাণীদের সমুদ্রতীরেই তৈরি অস্থায়ী গবেষণাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে আরম্ভ করেন। পরে সমুদ্রতীরেই 'স্ট্যাজিয়োন জুলজিকা' (Stazione Zoologica) নামে স্থায়ী গবেষণাগারের প্রথম সৃষ্টি হয়, ইটালীর নেপল্‌সে। সালটা ১৮৭২ ও সৃষ্টিকর্তা এক জার্মান বিজ্ঞানী। এই সালটা আরো বেশী স্মরণীয় এই জন্য যে ঐ বছরেই এইচ্ এম্ এস্ চ্যালেঞ্জারও তার অভিযান শুরু করে। এরপর ইংল্যান্ডের প্লিমথে (Plymouth) ১৮৭৯-তে সমুদ্রতীরে 'মেরিণ বায়োলজিক্যাল সোসাইটি অফ্ দি ইউনাইটেড্ কিংডম' (Marine Biological Society of the United Kingdom) নামের একটি সামদ্রিক গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা হয়।

আমেরিকায় প্রথম সামুদ্রিক গবেষণাগারের সৃষ্টি হয় ম্যাসাচুসেট্‌সে। নাম 'মেরিণ বায়োলজিক্যাল ল্যাবোরেটরি অ্যাট্ উড্‌স্ হোল' (Marine Biological Laboratory at Woods Hole)। উড্‌স্ হোল গবেষণাগার বহু বছর সময় নিয়ে তৈরি হয়। হারভার্ডের জীববিজ্ঞানী লুইস্ আগাসিজ (Louis Agassiz) ১৮৭৩-এ কেপ্ অ্যান-এ (Cape Ann) তৈরি তাঁর গবেষণাগার, উড্‌স্ হোলে স্থানান্তরিত করেন। ম্যাসাচুসেট্‌সের এই গবেষণাগার আজও পৃথিবীর প্রখ্যাত সামুদ্রিক গবেষণাগারগুলির অন্যতম। ১৯২৯-এ এখানেই উড্‌স্

হোল ওশেনোগ্রাফিক্ ইন্‌ষ্টিটিউশন (Woods Hole Oceanographic Institution) প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমুদ্র গবেষণার কাজ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামুদ্রিক গবেষণাগারের প্রয়োজনীয়তাও বাড়তে থাকে। সৃষ্টি হয় আমেরিকার প্যাসিফিক্ গ্রোভ-এ (Pacific Grove) হপ্‌কিনস্ মেরিণ স্টেশন (Hopkins Marine Station), ক্যালিফোর্নিয়ার লা জোলা-তে (La Jolla) স্ক্রিপ্‌স্ ইন্‌ষ্টিটিউশন অফ্ ওশেনোগ্রাফি (Scripps Institution of Oceanography) ও ওয়াশিংটনের ফ্রাইডে হারবার-এ (Friday Harbor) ফ্রাইডে হারবার মেরিণ ল্যাবোরেটরি (Friday Harbor Marine Laboratory)। এগুলি সবই বর্তমান বিশ্বের এক একটি শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক গবেষণাগার।

আমেরিকার এইসব বিখ্যাত সামুদ্রিক গবেষণাগারগুলি ছাড়াও ব্রিটেনের ওয়ার্মলেতে (Wormley) 'ন্যাশনাল ওশেনোগ্রাফিক ইন্‌স্টিটিউট' (National Oceanographic Institute), প্লিমথে ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ মেরিণ স্টাডিস্ (Institute of Marine Studies, University of Plymouth), ওয়েষ্ট হো, প্লিমথ-এর (West Hoe, Plymouth), প্লিমথ মেরিণ ল্যাবোরেটরি (Plymouth Marine Laboratory), জামার্ণীর কীল্ বিশ্ববিদ্যালয় (Keil University) ও উইলহেল্মশ্যাভেন-এর (Wilhelmshaven) সেনকেনবার্জ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (Senkenberg Institute), নেদারল্যান্ডের আ-হারেণ-এর (AE Haren) ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট ফর কোস্টাল এ্যান্ড মেরিণ ম্যানেজমেন্ট (National Institute for Coastal and Marine Management), টেক্সেল্-এর (Texel) 'দি নেদারল্যান্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউট ফর্ সি রিসার্চ (The Netherlands Institute for Sea Research) ও ইয়ারসিক্-এর (Yerseke) নেদারল্যান্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ ইকোলজি, সেন্টার ফর্ এসচুয়ারাইন্ এ্যান্ড কোস্টাল ইকোলজি (Netherlands Instituts of Ecology, Centre for Estuarine and Coastal Ecology), কানাডার নোভা স্কোসিয়া-তে (Nova Scotia) 'বেড্‌ফোর্ড ইন্‌স্টিটিউট্' ও 'ডালহাউসি বিশ্ববিদ্যালয় (Belford Institute and Dalhousie University), নিউ জিল্যান্ডের ওয়েলিংটনে 'নিউজিল্যান্ড ওশেনোগ্রাফিক্ ইন্‌ষ্টিটিউট' (New Zealand Oceanographic Institute), দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ্ টাউন্ বিশ্ববিদ্যালয় (University of Cape Town) ও জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়-এর (University of Tokyo) সামুদ্রিক ভূবিদ্যা ও ভূভৌতবিদ্যার গবেষণাগারগুলি উৎকর্ষের জন্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

ভারতের সমুদ্র বিজ্ঞানের গবেষণাগার 'ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট এফ্ ওশেনোগ্রাফি (NIO বা National Institute of Oceanography) পশ্চিম উপকূলীয় রাজ্য গোয়ার ডোনা পাওলায় অবস্থিত। এটি কাউন্‌সিল অফ্ সাইন্‌টিফিক্ অ্যান্ড ইনডাস্‌ট্রিয়াল রিসার্চ-এর (CSIR বা Council of Scientific and Industrial Research) সহযোগী স্বায়ত্বশাসিত গবেষণাগার। এর প্রধান কার্যালয় গোয়ায় হলেও ভাইজ্যাগ, কোচিন ও মুম্বাইতে এর আঞ্চলিক কেন্দ্র (Centre) আছে। ১৯৬৬-র ১লা জানুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিগত চার

দশকের কিছু বেশী সময়ে NIO একটি আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণার ও চর্চার বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। উত্তর ভারত-মহাসাগরের ভূ-তাত্ত্বিক, রসায়নিক, ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান বিষয়ক সমুদ্র বিজ্ঞানের খুটিনাটি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষনই-এর কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য।

ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ ওশেনোগ্রাফি প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল আর্ন্তজাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান (International Indian Ocean Expedition)। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই অভিযানে সংগৃহীত জৈবিক ও অজৈবিক নমুনাসমূহের বিশ্লেষণেও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এরপরই ষাটের দশকের গোড়ায় সি.এস.আই.আর্ (CSIR) ভারতের নিজস্ব সমুদ্র গবেষণা কেন্দ্র ও তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির বিষয় বিবেচনা করে। আজকের এন.আই.ও (NIO) তারই ফলশ্রুতি।

এই ইন্‌স্টিটিউট তৈরির সময় আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানে (IIOE) অংশগ্রহণকারী বহু বিজ্ঞানী ও প্রায়োগিক সহকারী (technical staff) এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে প্রায় ২০০ বিজ্ঞানী বহু গবেষক ছাত্র ও ১০০-র উপর প্রায়োগিক কর্মী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। এখনো পর্যন্ত আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর সহ উত্তর ও মধ্য ভারত মহাসাগরে বিভিন্ন অভিযান চালিয়ে এই সংস্থার বিজ্ঞানীরা ভারত মহাসাগরের তলদেশের বহু অজানা তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। বর্তমানে সমুদ্র বিষয়ক প্রধান ও ধ্রুপদী বিষয়গুলি ছাড়াও সামুদ্রিক প্রত্নবিদ্যা (Marine Archaeology), সামুদ্রিক ক্ষয় (Marine Corrosion), সমুদ্র কারীগরী বিদ্যা (Marine Engineering) প্রভৃতি সমুদ্রবিদ্যার নবতম বিষয়গুলিও এই ইনষ্টিটিউটের গবেষণায় অর্ন্তভূক্ত হয়েছে।

পরিচ্ছেদ-১৬

সোনার বা শব্দ নৌবাহবিজ্ঞান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় সমুদ্রবিজ্ঞান গবেষণার এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। ঐ সময় সোনার (Sonar) বা শব্দ নৌবাহবিজ্ঞান (Sound navigation) নামে এক নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে ঐ বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সাবমেরিণগুলির গতিবিধিকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। জলের তলায় চলমান বা স্থির কোন বস্তু থেকে আগত প্রতিফলিত শব্দ (echo) সোনারে রেকর্ড করা হয়। যে মহাসাগরকে একদিন মানুষ শব্দহীন, অসীম এক অন্ধকারের জগৎ বলে মনে করতো, সোনার আবিষ্কারে সেইসব ধারণা নস্যাৎ হয়ে যায়। জানা যায় জলের তলায় বেঁচে থাকা প্রাণীরা তাদের চলাফেরার সময় বহু রকমের শব্দ সৃষ্টি করে। সোনারের সাহায্যে এদের গতিবিধি থেকে অবস্থানের গভীরতা ও শব্দ তরঙ্গ রেকর্ড করা সম্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলমান তিমির দল যে শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে তার রেকর্ড বিজ্ঞানীরা করতে সক্ষম হয়েছেন। 'সিম্‌ফণি অথ্ দি ডিপ্ : সঙ্গস্ অফ্ হোয়েলস্ (Symphory of the deep : songs of whales) নামে তিমির গানের ক্যাসেটও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক (National Geographic) পত্রিকা প্রকাশ করেছে।

প্রতিধ্বনি রেখক যন্ত্র (Echo Sounder) যে সূক্ষতায় মহাসাগরীয় ভূত্বকের অসমতা নির্ণয় করতে পারে সোনার আবিষ্কারের পর তার সূক্ষতা আরো অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। মহাসাগরীয় ত্বকের উপর পললস্তরের উপরে সামান্যতম স্রোত বা তরঙ্গ-জাত পললের গঠন (ripples) সোনারের সাহায্যে নিরূপণ করা সম্ভব। অত্যাধুনিক 'সাইড্-স্ক্যান্-সোনারের' সাহায্যে আজ আমরা সমুদ্রের তলদেশের ছোট-বড় নুড়ির অবস্থান থেকে গভীর সমুদ্র তলের স্রোত-প্রবাহে সৃষ্টি হওয়া নানা রকমের পলির সঞ্চয়ন ও ক্ষয় সাধন প্রক্রিয়ার বিষয়ে জানতে পেরেছি। কোমেট মার্ক, কারেন্ট ক্রেসেন্ট্ জাতীয় পাললিক গঠনগুলি থেকে গভীর সমুদ্রে স্রোতের শক্তি ও গতির দিক নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রতিধ্বনিরেখক যন্ত্র ও তাদের বিবর্তন

ব্যাসল্ট সমৃদ্ধ ত্বকের উপরে পলল স্তরের বন্ধুরতা (unevenness) বিন্যাস ও বেধ (thickness) জানার জন্য ভূকম্পন রশ্মি প্রতিফলন (Seismic reflection) ও পলল স্তরের নিচের মহাসাগরীয় ভূত্বক ও ম্যান্টেলের উপরি অংশের স্তরবিন্যাসের জন্য ভূকম্পন রশ্মি

প্রতিসরণ-এর (seismic refraction) উপর নির্ভর করতে হয়। এই দুই পদ্ধতিই ভূভৌতবিদ্যার অধীন সব চেয়ে বেশী কার্যকারী প্রযুক্তি যাদের সাহায্যে সমুদ্র ত্বকের উপরি পৃষ্ঠের সমতা ও বন্ধুরতা থেকে আরম্ভ করে পললস্তরের বেধ ও নিচের ব্যাসল্ট শিলায় গঠিত মহাসাগরীয় ত্বকের বিন্যাস ও বিস্তৃতির বিষয়ে অপ্রত্যক্ষ উপায়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এই সব বিষয়ের পথিকৃৎ বিজ্ঞানীরা হলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লামন্ট ভূতাত্ত্বিক মানমন্দিরের (Lamont Geological Observatory) মরিস্ ইউইং (Maurice Ewing) ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহযোগী এম্ এন্ হিল (M.N. Hill), আর ক্যালিফোর্নিয়ার স্ক্রিপ্স্ ইন্স্টিটিউশন অফ্ ওশেনোগ্রাফির (Scripps Institution of Oceanography) আর রাইট (R. Raitt) ও জি শোর্ (G. Shor)।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে ভূকম্পন প্রতিফলন ও প্রতিসরণ পদ্ধতিগুলিরও প্রয়োগ কৌশলে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নিখুতভাবে গভীরতা পরিমাপক যন্ত্র (Precision Depth Recorder) তৈরি হওয়ার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতিধ্বনিরেখক যন্ত্রের (Echo Sounder) উদ্ভাবন হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে ব্যবহৃত সাব্‌মেরিণগুলির চলার গভীরতার তথ্য সংগ্রহ করা। এরপর ১৯৫০-এর দশকের প্রথমার্ধে প্রতিধ্বনিরেখক যন্ত্রটি সমুদ্র গবেষণার জন্য তৈরি জাহাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। সমুদ্রতলের সমতল অঞ্চলে প্রতিধ্বনিরেখক যন্ত্র গভীরতা সংক্রান্ত সঠিক তথ্য দিতে পারলেও সমুদ্র তলের বন্ধুর বা গড়ান অঞ্চল থেকে আসা পার্শ্ব প্রতিধ্বনিগুলি গভীরতা নিরূপণে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে থাকে। এরপরই আসে ইলেক্ট্রনিক প্রতিধ্বনিরেখক যন্ত্র (Electronic Echo Sounder)। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তৈরি স্থিতিশীল (Stable) ২ থেকে ৩ ডিগ্রী চওড়া সরু শব্দ রশ্মি গুচ্ছের (narrow beam) প্রতিধ্বনিরেখক যন্ত্র বন্ধুর ও গড়ান অঞ্চলের গভীরতা নিরূপণের ক্ষেত্রে আগের সমস্যাগুলির অনেকটাই সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। অযথা সময়ের অপহারক ও প্রায়শই গভীরতা সংক্রান্ত ভ্রান্ত তথ্য দিয়ে এতদিন যে কেবল্ প্রতিধ্বনিরেখক যন্ত্রের (Cable Echo Sounder) ব্যবহার চলছিল, ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তৈরি প্রতিধ্বনিরেখক যন্ত্র অনেক দ্রুততায় ও নিখুত ভাবে গভীর সমুদ্রের তলদেশের বহু বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছে। এই বিষয়ে উন্নততর গবেষণার আজও কোন শেষ নেই।

জার্মান সমুদ্র বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত মিটিয়র অভিযান (Meteor Expedition) ইলেক্ট্রনিক প্রতিধ্বনিরেখক যন্ত্রের ব্যবহার করে ১৯৫০-এর দশকে। এর সাহায্যেই দক্ষিণ আট্‌লান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে অবস্থিত মধ্য-আটলান্টিক শৈলশিরার (Mid Atlantic Ridge) অস্তিত্ব ধরা পরে। মিটিয়র আভিযান থেকেই আমরা গভীর সমুদ্রে পলিসঞ্চয়নের গড় পরিমান বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা পেয়েছি। এরপর ১৯৪৭-৪৮-এ সুইডেনের গবেষণা জাহাজ অ্যালবাট্রস্ (Albatross), হ্যানস্ পিটারসনের (Hans Piterson) নেতৃত্বে বিগত ১০ লক্ষ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে বেশ কয়েকটি তুষারযুগের (ice age) পরিসরে

সমুদ্রতলের পলি সঞ্চয়নে আবর্তিত (cyclic) পললস্তরের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করে। বলা বাহুল্য প্রতিধ্বনিরেখক যন্ত্র এইসব কাজে এক অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিল।

স্কুবা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই সমুদ্রবিদ্যা গবেষণা আরো এক ধাপ এগিয়ে যায় স্কুবা (চিত্র-৪৩) (SCUBA) বা সেল্ফ্ কনটেইন্ড আন্‌ডারওয়াটার ব্রিদিং অ্যাপারেটাস্ (Self contained underwater breathing apparatus) উদ্ভাবণের মাধ্যমে (চিত্র-৪৩)। জানা গেছে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইটালীর বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo de Vinci) প্রথম স্কুবার ডিজাইন্ করেছিলেন। যদিও প্রথম পূর্ণ সময়ের "স্কুবা" উদ্ভাবনের কৃতিত্ব উইলিয়াম্ জেমস্-কেই (Willium James) দেওয়া হয়। আবিষ্কারের সাল ১৮২৫। স্কুবার বিশেষ প্রযুক্তি ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ইমাইল্ গ্যাগম্যান-এর (Emile Gagman) তৈরি। গ্যাগম্যান্ ও জ্যাকিস্ কনস্‌টিয়েন (Jacques Constean) পরে যন্ত্রটিকে আরো সংস্কার করেন যাতে স্কুবা ডুবুরীরা জলের তলায় সংকুচিত বাতাস (compressed air) শ্বাস নেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারে। শীতল জলের তলায় ডুবুরীর দেহের উষ্ণতা রক্ষা করার মত যন্ত্রের ব্যবহার ছাড়াও স্বাধীনভাবে চলাফেরার উপযুক্ত যন্ত্রও পরে স্কুবায় সংযোজিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে জলের তলায় ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলার ব্যবস্থা স্কুবাকে উন্নততর মানে পৌঁছে দিয়েছে।

চিত্র-৪৩: স্কুবা ডাইভিং

জ্যাকিস কনস্‌টিয়েন তার সারা জীবন সমুদ্রে স্কুবা ডাইভিং (SCUBA Diving) করে কাটিয়েছেন। তাঁর লেখা বই-এর ফিল্ম টেলিভিশনের পর্দায় সম্প্রচারিত হয়েছে। শুধু সমুদ্রতলের অসাধারণ জগতের ছবি উপহার দিয়েই কনস্‌টিয়েন বিরত থাকেননি। তাঁর দেওয়া তথ্যেই আমরা সমুদ্র দূষণ-এর (marine pollution) প্রথম ইঙ্গিত পাই। স্কুবা ডাইভিং করে পচনশীল জৈব পদার্থের সঞ্চয়ন থেকে সমুদ্র দূষণের চিত্র ইনিই আমাদের উপহার দিয়েছেন। সাধারণভাবে স্কুবা ৫০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় কাজ করার জন্য বিশেষ উপযোগী। তাই উপকূলীয় অঞ্চলে জলের তলার প্রবাল প্রাচীর (Coral reef) ও তাদের সঙ্গে অবস্থানরত মাছ ও অন্যান্য প্রাণীদের প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার জন্য স্কুবা ডাইভিং প্রায় অপরিহার্য। জলের তলার বালি, কাদা থেকে প্রাণীদের নমুনা সংগ্রহে ও স্কুবা ব্যবহৃত হয়।

সাব্‌মার্সিবেল্‌স্‌

গভীর সমুদ্রে নেমে সেখানকার পরিবেশের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও নানাবিধ তথ্য সংগ্রহের জন্য তৈরি হলো সাবমার্সিবেলস্‌ (Submersibles)। সৃষ্টির পর থেকে এর গঠন প্রক্রিয়াতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সমুদ্রের তলদেশে অবতরণ করার পর এই যন্ত্রটিকে সমুদ্রতলে স্থির অবস্থায় রেখে গবেষণার কাজ চালানো সম্ভব। এর ভিতরে ডুবুরী পূর্ণ স্বাচ্ছন্দে ও প্রয়োজনীয় উষ্ণতায় বহুদিন থাকতে পারে। সাবমার্সিবেলস্‌ আবার দুই ধরণের কাজের উপযুক্ত হিসাবে তৈরি হয়েছিল। (ক) একটি সাব্‌মার্সিবেল্‌ থেকে ডুবরী অন্য কোন সাবমার্সিবেলে যাতায়াতে সক্ষম হবে অর্থাৎ সেটি হবে চলমান সাবমার্সিবেল। আর (খ) ডুবুরী একটি স্থির সাব্‌মার্সিবেলে থেকে বহু সময় ধরে কাজ করতে সক্ষম হবে।

সাব্‌মার্সিবেলের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ১৯৩০-এ ওটিস্‌ বার্টণ (Otis Barton) প্রথম ব্যাথিস্ফিয়ার (bathysphere) নামের স্টীলের তৈরি ও গভীর সমুদ্রে নিমর্জিত হওয়ার উপযোগী একটি শূন্যগর্ভ গোলক তৈরি করেন। এটিকে কোন ভাসমান জাহাজের থেকে স্টীলের কেবল বা তারের সঙ্গে বেঁধে সমুদ্রে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। গোলকের ভিতর পর্যাপ্ত বায়ুর ব্যবস্থা থাকলেও এর ভিতরের বিদ্যুৎ ও ভাসমান জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকতো বিদ্যুৎবাহী কোন কেবলের মাধ্যমে।

১৯৩৪-এ উইলিয়াম বীব্‌ ও ওটিস্‌ বার্টন (William Beebe and Otis Barton) এই ব্যাথিস্ফিয়ারে ৩,০২৮ ফুট গভীর সমুদ্র তলদেশে পৌঁছেছিলেন। ১৯৪৮-এ বার্টন আরো একটি উন্নত প্রযুক্তির ব্যাথিস্ফিয়ার তৈরি করে ৪০৫০ ফুট গভীর সমুদ্রতলে পৌছে যান। ব্যাথিস্ফিয়ারের এই জয়যাত্রাকে অক্ষুন্ন রেখে ১৯৫৪-তে জি হুট ও পি উইলিয়াম (G. Houot ও P. William) পশ্চিম আফ্রিকার ডাকারের পশ্চিম প্রান্তের আটলান্টিক মহাসাগরের ১৩,২৮৪ ফুট গভীরে অবতরণ করেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একটাই আর সেটা হচ্ছে গভীর থেকে গভীরতর সমুদ্র তলদেশের বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ।

সাবমার্সিবেলের বিবর্তনের পরের ধাপে এলো ব্যাথিস্কেফ (bathyscaphe)। সুইজারল্যান্ডের পদার্থবিদ্‌ ও ইঞ্জিনিয়ার অগাষ্টি পিকার্ড (Auguste Piccard) 'ট্রিস্‌টি-২' (Trieste-II) নামের এই ব্যাথিস্কেফটি তৈরি করেন। ইটালীর অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পারে ট্রিস্‌টি শহরে তৈরি হয়েছিল বলে ঐ জলযানের নাম 'ট্রিস্‌টি' দেওয়া হয়।

চিত্র-৪৪: জ্যাকিস্‌ পিকার্ড ও ডন ওয়ালস্‌

১৯৫৮-তে ইউ এস্ নেভি ইলেকট্রনিক্ ল্যাবোরেটরি (V.S. Navy Electronic Laboratory) এটিকে কিনে নেয়। এরপর এলো সেই স্মরণীয় দিন, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৬০। সমগ্র পৃথিবী জানতে পারলো যে অগাষ্টি পিকার্ডের ছেলে জ্যাকিস পিকার্ড ও আমেরিকার নৌ-সেনা অফিসার ডন্ ওয়াল্স্ (Jaques Piccard and Lt. Don Walsh) টিস্‌টি-২তে চেপে মহাসাগরগুলির অন্যতম গভীর অঞ্চল প্রশান্ত মহাসাগরের মেরিয়ানা খাতের (Mariana trench) তলদেশে অর্থাৎ ৩৫,০০০ ফুট গভীরে পৌছে গেছে। সার্থক অভিযান শেষে এরা ট্রিস্‌টিতে চেপে আবার উপরে উঠে আসেন (চিত্র৪৪)।

অগাষ্টি পিকার্ডের এই ব্যাথিস্কেফের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে কোনও রকম যান্ত্রিক গোলযোগ হলে ট্রিস্‌টি-২ ভেসে উঠতে সক্ষম হবে। গ্যাসোলিন ভরা থাকতো বলে এটি কাজ করতো গ্যাস বেলুনের নীতিতে। বার্টনের ব্যাথিস্ফিয়ারে এই ধরণের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় উপরের জাহাজ থেকে ঝোলান কেবল্ কোন ভাবে ছিঁড়ে গেলে ব্যাথিস্ফিয়ারের আর উঠে আসার ক্ষমতা থাকতো না। ফলে দুর্ঘটনায় পড়লে বিজ্ঞানীর (ডুবুরী) মৃত্যু ছিল অনিবার্য।

এর আরো পরে অগাষ্টি পিকার্ড সমুদ্রের মাঝামাঝি গভীরতায় চলতে সক্ষম হেলিকপ্টার মডেলের একটি ডুবো জাহাজ বা মেসোস্কেফ্ (Mesoscaphe) তৈরি করেন। এটি সমুদ্রের প্রায় ৬০০০ ফুট গভীরতায় নেমে সেখানকার পরিবেশ সংক্রান্ত নানা তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম ছিল। গভীর সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতায় নেমে কাজ করার উপযোগী জলযান সৃষ্টির সার্থে সাব্মার্সিবেলের রূপান্তরও চলছিল তাল মিলিয়ে। এই পর্যায়েই এলো অ্যালুমিনট্ (চিত্র-৪৫ক) (Aluminaut)। অ্যালুমিনিয়াম ধাতু দিয়ে তৈরি ও তার আরোহী নাবিক এই দুই শব্দের সহযোগে এই সাব্মার্সিবেলের নামাকরণ হয় যা ১৫০০০ ফুট গভীরে অবতরণ করে সেখানকার পরিবেশে কাজ করার উপযোগী হিসাবে তৈরি হয়েছিল। এরপর স্ক্রিপস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন অফ্ ওশেনোগ্রাফি ৩৫৫ ফুট লম্বা 'ফ্লিপ্' (Flip) অর্থাৎ 'ফ্লোটিং ইন্‌স্ট্রুমেন্ট প্ল্যাটফর্ম' (Floating Instrument Platform) নামের একটি সমুদ্র গবেষণা যান তৈরি করে যা জলের উপর অনুভূমিক অবস্থা থেকে উল্লম্ব অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে সমুদ্র বিষয়ক বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ চালাতে সক্ষম। উল্লম্ব অবস্থায় ফ্লিপের একটি অংশ জলের তলায় ও একটি অংশ সমুদ্র পৃষ্ঠের (sea level) উপরে থাকে।
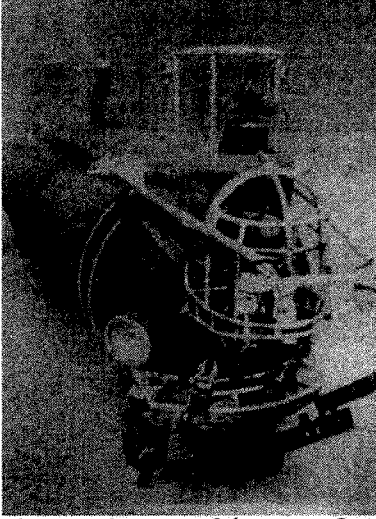
চিত্র-৪৫(ক): সাবমার্সিবেল এ্যালুমিনট্

বর্তমান সময়ের উন্নত সাব্মার্সিবেলের মধ্যে অ্যাল্‌ভিন্ (চিত্র-৪৫খ) (ALVIN)

অন্যতম। ১৯৭১-এ 'ফেমাস্' FAMOUS অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ-আমেরিকান্ মিড্ ওশেন্ আন্ডারসি স্টাডি' (French American Mid Ocean Undersea Study) প্রজেক্টের সময় এর প্রথম ব্যবহার হয় এবং তারপর থেকে মহাসাগরের তলদেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থানের গবেষণায় একে কাজে লাগানো হয়েছে। ফেমাস্ অভিযানে মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরায় অ্যাল্‌ভিন্ কাজ করে। স্থানটি ছিল আটলান্টিক মহাসাগরে অ্যাজোরেস্ দ্বীপমালার (Azores Islands) দক্ষিণে। জলের তলার ছবি তোলার উপযুক্ত ক্যামেরা, দিক্ নির্দেশক যন্ত্র ও 'সোনার' (Sonar) সম্বলিত অ্যালভিন্ মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা অঞ্চলের শিলা, লাভা ও পলির নমুনা সংগ্রহ করা ছাড়াও গভীরতার তারতম্য ও ভূ-তাত্ত্বিক বহু বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করেছিল।
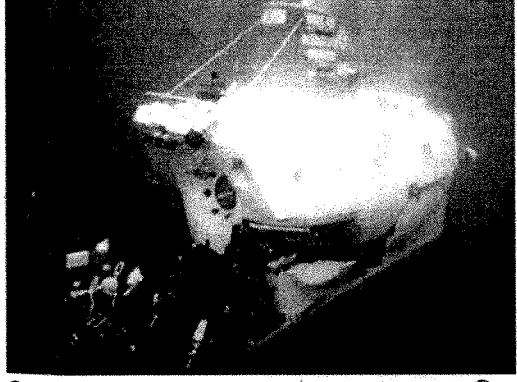
চিত্র-৪৫(খ): ফেমাস প্রোজেক্টে ব্যবহৃত অ্যালভিন্ সাবমার্সিবেল্

১৯৭৭-এ ভূবিজ্ঞানী জে করলিস্ (J. Corliss) ও তাঁর সহযোগীরা অ্যালভিনের সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগরের গ্যালাপাগোস্ প্রসারণ শিরা (Galapagos Spreading Ridge) অঞ্চলে একটি উষ্ণ প্রস্রবণের (Hotspring) সক্রিয় অঞ্চলের সন্ধান পান। স্কুবা ডাইভিং-এর পথিকৃত জ্যাকিস কনস্টিয়েনও অ্যালভিনের সাহায্যে গভীর সমুদ্রে নেমেছিলেন। এই সাব্‌মার্সিবেলের সাহায্যেই ক্যারিবিয়ান সাগরের মধ্য-কেম্যান শিরা (Mid Cayman Rise) থেকে শিলার নমুনা সংগ্রহ করে মহাসাগরীয় ভূত্বকের তৃতীয় স্তর (layer 3) যে প্রধাণত গ্যাব্রো (Gabbro) জাতীয় শিলায় তৈরি তা জানা সম্ভব হয়েছে।

অ্যালভিন্ ছাড়াও আধুনিক ও উন্নততর প্রযুক্তিতে তৈরি 'সায়না' (CYANA) সাব্‌মার্সিবেল সমুদ্রতলের বহু অজানা রহস্যের কিনারা করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

নতুন তথ্য সংগ্রহে সাব্‌মার্সিবেলগুলির কর্মক্ষমতা অতুলনীয়। মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরা ও তাদের অক্ষ বরাবর গ্রস্থ উপত্যকা (rift valley) অঞ্চলের অগ্ন্যুদ্‌গিরণের প্রকৃত প্রক্রিয়া ও নমুনা জানা সম্ভব হয়েছে সাব্‌মার্সিবেল-এর সাহায্যে। এদের সাহায্যেই আমরা জানতে পেরেছি সমুদ্রের তলদেশে অবস্থিত ঔদকতাপীয় (hydrothermal) অঞ্চলগুলির কথা। ঔদকতাপীয় মণিক অবক্ষেপ ও সংযোজনের (hythrothermal mineral precipitates and deposits) বিষদ ব্যাখ্যায় সাব্‌মার্সিবেল্-এর মাধ্যমে সংগৃহিত নমুনার ভূমিকা অতুলনীয়। সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis) ছাড়া যে সব প্রাণী সমুদ্রের গভীরে ব্যাক্‌টেরিয়ার উপর জীবনধারণ করে, তাদের অস্তিত্ব ও বসবাসের নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে সাব্‌মার্সিবেলের সাহায্যে।

পরিচ্ছেদ-১৭

ভূকম্পহীন শিরা ও স্যার এ এস্ লটন্

স্যার এ এস্ লটন (Sir A.S. Laugnton) ও তাঁর সহযোগী কিছু বিজ্ঞানী ১৯৭০-এ মহাসাগরীয় ভূত্বকে (Oceanic Crust) এক বিশেষ ধরণের নিষ্ক্রিয় (inactive) ভূকম্পহীন (aseismic) শিরার (ridge) অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। ভূকম্পহীন শিরা বা অ্যাসাইস্মিক রিজ (aseismic ridge) নামটিও এঁদের দেওয়া। এই নামের তাৎপর্য হলো এইসব মহাসাগরীয় ভূত্বকের শিরাসমূহে কখনো ভূকম্পন অনুভূত হয়না, ফলে এরা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিরাজমান থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগরে এদের অবস্থান। আকৃতিতে কোনটি কয়েক শ থেকে কয়েক হাজার কিমি দীর্ঘ, কোনটি বা আবার মালভূমি আকৃতির। এদের মাথার উপর জলস্তম্ভের উচ্চতা ২ থেকে ৩ কিমি। কোন কোন শিরা মহাসাগরীয় ভূত্বকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে একাকী অবস্থান করে, কোনও কোনটি আবার মহাদেশের সীমানা বা মধ্যসাগরীয় শৈল শিরার সঙ্গে সাযুয্য রেখে অবস্থানরত। ভারত মহাসাগরের বুকে ব্রোকেন শিরা (Broken Ridge), নাইন্টি ইষ্ট্ শিরা (Ninetyeast Ridge), চাগোস্-লাক্ষাদ্বীপ শিরা (Chagos Laccadives Ridge), ম্যাসকারাইন মালভূমি (Masarine Plateau) (চিত্র-৪৬) এইসব ভূকম্পহীন শিরা অঞ্চলের উদাহরণ। ঠিক একইভাবে আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরেও এই ধরণের বহু ভূকম্পহীন শিরার অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে।

এইসব শিরার সৃষ্টির ইতিহাসকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। (ক) মহাসাগরীয় ভূত্বকের কিছু অংশের উল্লম্ফন (upliftment), (খ) মহাদেশ থেকে কোন ছোট ভূখণ্ডের বিচ্ছিন্নতা হেতু মহাসাগরে অবস্থান ও (গ) মহাসাগরীয় ভূত্বকের নিচে অবস্থানরত কোনও হট্ স্পট্ (hot spot) থেকে নির্গত লাভার সঞ্চয়ন। বিভিন্নভাবে এই সব নিষ্ক্রিয় শিরাগুলি তৈরি হলেও ম্যান্টেল থেকে উদ্ভূত হট্ স্পটের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্টি হওয়া শিরাগুলিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

হট্স্পট্ ও শিলামণ্ডলীয় প্লেটের অনপেক্ষ গতি

যদিও পৃথিবীর অধিকাংশ অগ্ন্যুৎপাত বলয়গুলি প্লেট সীমানায় অবস্থিত, তা সত্বেও বেশ কিছু সংখ্যক অগ্ন্যুৎপাত প্রবণ অঞ্চল প্লেটের অভ্যন্তরেও পরিলক্ষিত হয়। সামুদ্রিক প্লেটগুলির মধ্যস্থ এই ধরণের অগ্ন্যুৎপাত প্রবণ অঞ্চল দীর্ঘ অগ্ন্যুৎপাত বলয় বা ছাড়া ছাড়া অগ্ন্যুৎপাত জাত দ্বীপমালার সৃষ্টি করে। মহাসাগরীয় ভূত্বকে এই ধরণের দ্বীপ মালা প্রায়শই একে অন্যের
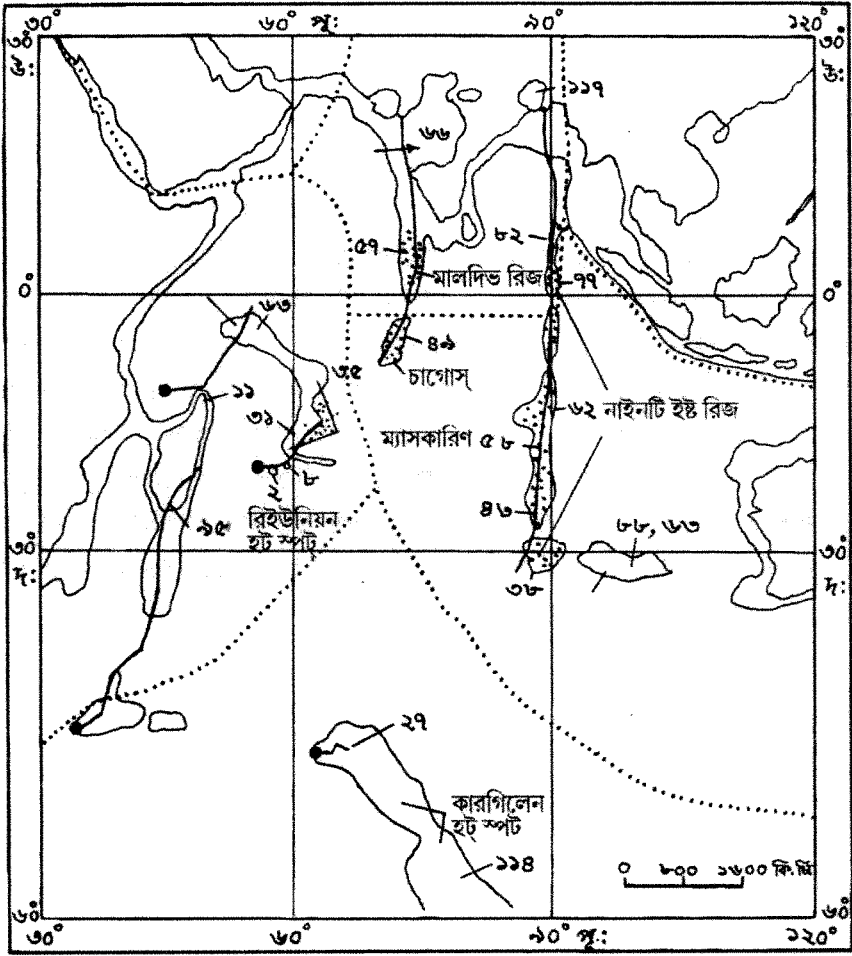
চিত্র-৪৬ ভারত মহাসাগরে হট্ স্পটের সঙ্গে জড়িত ভূকম্পহীন শিরাগুলিকে দেখানো হয়েছে। কালো বিন্দুগুলি হট্ স্পটের অবস্থান ও সংখ্যাগুলি তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে নির্ধারিত শিরা বরাবর বয়ক্রমের তফাৎ (মিলিয়ন ইয়ারে) নির্দেশ করছে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিস্তৃত প্রায় সমান্তরাল 'নাইনটি ইষ্ট রিজের সঙ্গে কারগিলেন হট্ স্পটের ও ম্যাসকারিণ-চাগোস্-মালদিভ রিজের সঙ্গে রিইউনিয়ন হট্স্পটের সম্পর্ক লক্ষ্যণীয়।

সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করে। প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই-এম্পারর দ্বীপমালা (৪০০০ কিমি) মারকুইয়েস্ দ্বীপমালার সমান্তরাল। আবার ভারত মহাসাগরের নাইন্‌টি ইষ্ট রিজ ও চাগোস- লাক্ষাদ্বীপ দ্বীপমালা একে অন্যের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে সাজান। সমুদ্রত্বকে এইসব দ্বীপমালা সৃষ্টির পরে আর কোন উল্লেখযোগ্য ভূকম্পন অনুভূত হয় না বলে এদের ভূকম্পনহীন রিজ বা aseismic ridge বলে। এই ধরণের দ্বীপগুলি পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় ১০ শতাংশ স্থান অধিকার করে আছে।

সমুদ্র বক্ষে এদের বয়স সব সময়েই সেখানকার মহাসাগরীয় ভূত্বকের থেকে কম। এইসব দ্বীপের ব্যাসল্ট লাভার উপাদান মধ্যসাগরীয় শিরার ব্যাসল্ট থেকে আলাদা কারণ এরা অ্যাস্‌থেনোস্ফিয়ারের নিচের গভীর ম্যান্টেল ও অ্যাস্‌থেনোস্ফিয়ারের উপাদানের একটি মিশ্রণ থেকে তৈরি। গভীর ম্যান্টেল থেকে শিলামন্ডলের উপরে উঠে আসা ম্যাগমার এই ধরণের অঞ্চলগুলিকে তাই 'ম্যান্টেল শিখা'ও (Mantle plume) বলে।

এইসব অ্যাসাইমিক্ বা ভূকম্পবিহীন ভলকানিক দ্বীপগুলির একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বয়ক্রমের তারতম্যও লক্ষ্যণীয়। বিজ্ঞানী জে টি উইলসন্ দেখালেন যে ম্যান্টেলে স্থির কোন হট্ স্পটের উপর দিয়ে শিলামণ্ডলের নির্দিষ্ট দিকে চলনের ফলে এই দ্বীপমালার সৃষ্টি হয়। আর সেই কারণেই হট্ স্পট্ থেকে সব চেয়ে দূরে সরে যাওয়া আগ্নেয়গিরিটি বয়সে প্রাচীনতম ও হট্ স্পটের নিকটতম আগ্নেয়গিরিটি বয়সের হিসাবে নবীনতম হয়ে থাকে (চিত্র-৪৬)। প্লেট্ টেকটনিকস্ তত্ত্বে শিলামণ্ডলের প্লেটগুলির আপেক্ষিক চলনের মূলে আছে পার্শ্বাভিমুখী বল (lateral force)। কিন্তু হট্ স্পট প্রক্রিয়ায় প্লেটগুলির চলনের মূল শক্তি নিহিত থাকে ম্যান্টেল থেকে সৃষ্টি হওয়া উল্লম্ব বলের (vertical force) মধ্যে আর তাই এদের গতিও অনপেক্ষ (absolute)।

পরিচ্ছেদ-১৮

প্লেট্ টেক্‌টনিক্‌স্

মহী সঞ্চরণ (Continental drift), মেরু সঞ্চার (Polar wandering), সমুদ্র তলদেশের প্রসারণ (Sea floor spreading) প্রভৃতি প্রকল্পগুলির আবিষ্কার ভূবিজ্ঞানের ভিত্তি ভূমিকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে থাকে। এর পরবর্ত্তী সময়ে ১৯৬৮ তে পরিবর্তী চ্যুতি (transform fault) ও সমুদ্র তলদেশের প্রসারণ প্রকল্পের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় প্লেট টেক্‌টনিক্‌স্ তত্ত্বের (theory of plate tectonics)। এই তত্ত্ব এমন একটি প্ল্যাটফর্মের সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন গাঠনিক ঘটনাসমূহকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। প্লেট টেক্‌টনিক্‌স্-এর আলোয় মহাদেশ মহাসাগরের পারস্পরিক সম্পর্ক, মহাদেশীয় পর্বতমালার সৃষ্টি, মধ্যসাগরীয় শিরা (mid ocean ridge), সমুদ্র সীমায় অবস্থানরত দ্বীপমালা ও গভীর খাত সমূহ, ভূ-কম্পন ও আগ্নেয়গিরি বলয়ের সৃষ্টির ইতিহাস সমূহ অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। আজকের ভূবিদ্যার পাঠ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই প্লেট্ টেক্‌টণিক্‌স্ নির্ভর। বি আইস্যাক, জে অলিভার ও এল আর সাইকস্ (B. Isack, J. Oliver and L.R. Sykes) ১৯৬৮তে, ডাব্লু জে মরগ্যান (W.J. Morgan) ১৯৬৮ ও ১৯৭২-এ ও একস্ লি পিখন (X. Le. Pichon) ১৯৬৮ তে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে প্লেট টেকটনিক্‌স্-এর সাহায্যে পৃথিবীর বহুবিধ ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্লেট টেকটনিক্‌স্-এর মূল বিষয়টিতে কল্পনা করা হলো যে পৃথিবীর শিলামণ্ডল (Lithosphere) কতগুলি বড় ও ছোট প্লেটের সম্বলিতরূপ। এই প্লেটগুলি একে অন্যের সঙ্গে গায়ে গায়ে সন্নিবিষ্ট অবস্থায় শিলামণ্ডলের নিচে অবস্থানরত ভারী, তপ্ত ও প্লাষ্টিক-কঠিন অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার-এর (asthenosphere) উপর ভাসমান অবস্থায় আছে। নিচের অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের নড়াচড়ার সঙ্গে এই প্লেটগুলির সরণ (movement) চলতে থাকে। আর তারই সঙ্গে চলতে থাকে পৃথিবীর শিলামণ্ডলের (মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয়) উপর বহুবিধ গাঠনিক প্রক্রিয়া। প্লেট্ টেক্‌নিক্‌স্ তত্ত্বের মূল উপজীব্য বিষয়গুলিকে এইভাবে সাজান যায় :

ক) শিলামণ্ডলের (lithosphere) প্লেটগুলি দৃঢ় ও ঠান্ডা শিলায় তৈরি। এরা ভারী, তপ্ত, প্ল্যাস্টিক-কঠিন, প্রায় ৬০০ কিমি পুরু অ্যাস্‌থেনোস্ফিয়ারের (asthenosphere) উপর চাদরের মত ভাসমান অবস্থায় থাকে।

খ) অ্যাস্‌থেনোস্ফিয়ারের উপর সামুদ্রিক শিলামণ্ডলের প্লেটগুলি মাত্র ৬-৭ কিমি পুরু। অন্য দিকে মহাদেশীয় শিলামণ্ডলের প্লেট সমূহের বেধ (thickness) ১০০ কিমি পর্যন্ত

হয়। উপরের শিলামণ্ডল ও তার নিচের অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের সীমানা একটি 'থার্মাল বাউন্ডারী' (চিত্র-৪৭)।
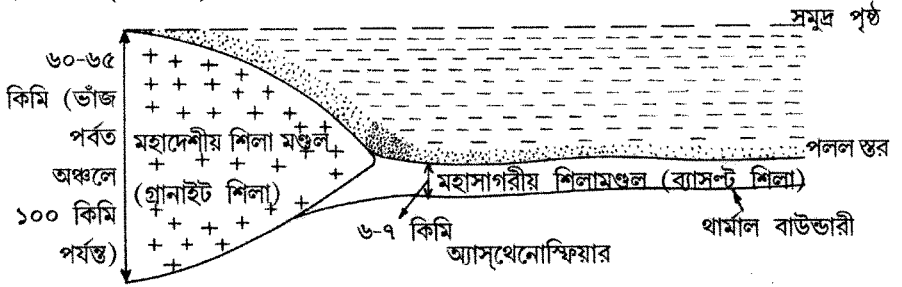
চিত্র-৪৭ অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের উপর মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় শিলামণ্ডলের বেধের তফাৎ দেখানো হয়েছে।

গ) শিলামণ্ডলের উপর ভূকম্পন বলয়গুলির সংযোগ সাধন করে প্লেটগুলির সীমানা নির্ধারিত হয় কারণ প্রতিটি প্লেটের সীমানায় প্লেটগুলির পারস্পারিক গতির ফলে ভূকম্পন একটি অনিবার্য ঘটনা।

ঘ) বর্তমান পৃথিবীতে বড় প্লেটগুলির সংখ্যা ছয়। এরা হলো আমেরিকান প্লেট (এই প্লেটটিকে উত্তর আমেরিকান প্লেট ও দক্ষিণ আমেরিকান প্লেট নামের দুটি সতন্ত্র প্লেট হিসাবেও বিবেচনা করা হয়), আফ্রিকান প্লেট, ইন্দো-অস্ট্রেলিয় প্লেট, প্যাসিফিক্ প্লেট, ইউরেশীয় প্লেট ও অ্যান্টার্কটিক্ প্লেট। এছাড়া এই প্লেটগুলির অন্তবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য ছোট ও মাঝারি আকৃতির প্লেট আছে (চিত্র-৪৮)।
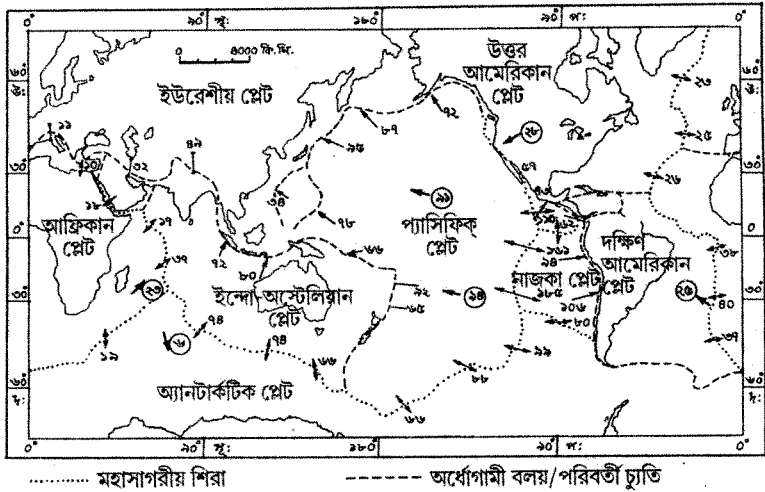
চিত্র-৪৮ পৃথিবীর প্রধান টেক্টনিক্ প্লেটগুলির সঙ্গে তাদের সীমানায় কিছু নির্ধারিত স্থানে গতির হার (বছরে মিমি) ও গতির দিক তীর চিহ্নে দেখানো হয়েছে। বৃত্তের মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলি হট্স্পটের সাপেক্ষে প্লেটগুলির অ্যাবসলিউট্ গতির হার (বছরে মিমি হিসাবে) নির্দেশ করছে। 'ডট' লাইনে মধ্য সাগরীয় শিরা ও 'ড্যাস্' লাইনে প্লেটের অধোগামী ও পরিবর্তী চ্যুতি অঞ্চল দেখানো হয়েছে।

ঙ) কোথাও কোথাও মহাদেশ ও মহাসাগরের সীমানাগুলি প্লেট সীমানা হলেও বহু ক্ষেত্রেই দুটি প্লেটের সীমানা একটি মহাদেশের মধ্যে বা একটি মহাসাগরের মধ্যে অবস্থান করে। ফলে একটি শিলামণ্ডলীয় প্লেটের মধ্যেই একটি সম্পূর্ণ মহাদেশ ও এক বা একাধিক মহাসাগরের অংশ বিশেষকে অবস্থান করতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় আফ্রিকান প্লেটের বিস্তৃত সীমানাকে। আফ্রিকান্ প্লেটের মধ্যে সম্পূর্ণ আফ্রিকা মহাদেশ ছাড়াও পূর্বে ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের অংশ বিশেষ ধরা রয়েছে।

চ) প্লেটগুলির সীমানা প্রধানত তিন ধরণের। ১) অপসারি সীমানা (diverging plate boundary) বা গঠনমূলক সীমানা এখানে দুটি প্লেট একে অন্যের থেকে দূরে সরে যায়। এদের অর্ন্তবর্তী অঞ্চলে নতুন সাগরের জন্ম হয়। মহাসাগরীয় শিলামণ্ডলের দুটি প্লেট পরস্পর একে অন্যের থেকে সরে গেলে মধ্যবর্তী অঞ্চলে সৃষ্টি হয় মধ্য মহাসাগরীয় শিরা (চিত্র ৪৯) বা Mid Oceanic Ridge। এই অঞ্চল থেকে লাভা নির্গমনের ফলে সমুদ্রতলের সম্প্রসারণ চলতে থাকে। (২) অভিসারী সীমানা (converging plate boundary) বা ধ্বংসাত্বক সীমানা এখানে দুটি অভিসারী প্লেট পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। দুটি মহাদেশীয় শিলামণ্ডলের প্লেটের সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় ভাঁজ পর্বতমালার। ইন্দো-অস্ট্রেলিয় প্লেটের উত্তরমুখী গতির ফলে ইউরেশীয় প্লেটের সঙ্গে সংঘর্ষে যেমনভাবে হিমালয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই দুটি প্লেটের মধ্যবর্তী টেথিস্ মহাসাগরীয় প্লেট ইউরেশীয় প্লেটের দক্ষিণে অবনমিত হয়ে টেথিস মহাসাগরের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে, যার আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই।
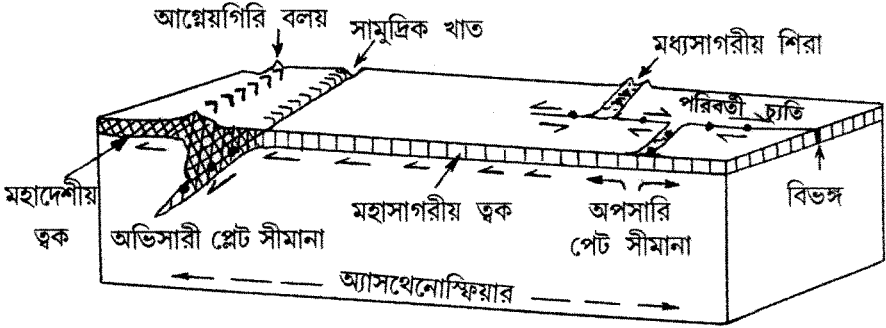
চিত্র-৪৯ প্লেট টেকটনিক্স্ মডেল অনুযায়ী অভিসারী ও অপসারি প্লেট সীমানায় বিভিন্ন গাঠনিক বিষয়। পরিবর্তী চ্যুতির সাপেক্ষে মধ্যসাগরীয় শিরার অফ্‌সেট্ লক্ষণীয়।

আবার একটি মহাসাগরীয় শিলামণ্ডলের প্লেট অন্য একটি মহাদেশীয় শিলামণ্ডলের প্লেটের সঙ্গে সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে এলে তার পরিনামে সামুদ্রিক শিলার ভারী প্লেটটি মহাদেশীয় প্লেটের নিচে অধোগামী (subduction) হয়। সামুদ্রিক প্লেটটি নিমজ্জনের সঙ্গে সেখানে সৃষ্টি হয় মহাসাগরীয় খাতের (oceanic trench) আর মহাদেশের প্রান্তে তার সীমানা বরাবর সৃষ্টি হতে থাকে সুউচ্চ পবর্তমালার। দক্ষিণ আমেরিকান প্লেটের পশ্চিম প্রান্তের

সাপেক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্ভুক্ত নাজকা প্লেটের (Nazca plate) অধোগমনে ৪৫০০ কিমি লম্ব ও ৭-৮ কিমি গভীর পেরু-চিলি খাতের (Peru Chile trench) সৃষ্টি হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের সীমানায়। এর সমান্তরালে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম সীমানায় আমরা পেয়েছি অ্যান্ডিস পর্বতমালাকে।

এই ধরনের অভিসারী প্লেটের সীমানাগুলি আবার ভূকম্পন ও অগ্ন্যুৎপাত প্রবণ। এছাড়া সামুদ্রিক শিলামণ্ডলের প্লেট কোথাও সামুদ্রিক দ্বীপমালার নিকটবর্তী হয়ে অধোগামী হলে প্লেটের সীমানা বরাবর সমুদ্রখাতের বলয়ের পাশাপাশি আগ্নেয়গিরি বলয়ের সৃষ্টি হয় (চিত্র ৪৯)। প্রশান্ত মহাসাগরের সীমানা, দ্বীপবলয় ও মহাদেশ সম্বলিত প্লেটের সাপেক্ষ অধোগামী হওয়ায় এই মহাসাগরকে ঘিরে তৈরি হয়েছে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বলয় যা 'রিং অফ্ ফায়ার' (Ring of Fire) নামে প্রসিদ্ধ।

৩) পরিবর্তী চ্যুতি (transform fault) সীমানায় বা রক্ষণশীল সীমানায় পৃথিবী পৃষ্ঠের সঙ্কোচন বা প্রসারণ হয় না। এখানে পাশাপাশি দুটি প্লেটের সীমানার মধ্যে স্পর্শক (tangential) সম্পর্ক অর্থাৎ একটি প্লেট তার দৈর্ঘ বরাবর অন্য প্লেটটির দৈর্ঘের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করে। এই ধরণের প্লেট সীমানা ভীষণভাবে ভূকম্প প্রবণ হলেও অগ্ন্যুৎপাত বর্জিত।

ছ) পৃথিবীপৃষ্ঠের প্লেটগুলির গতি অয়লরের মতবাদ (Euler's theory) দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। অয়লার দেখিয়েছেন যে দুটি প্লেটের আপেক্ষিক গতিকে (relative motion) একটি মেরুর সাপেক্ষে কৌণিক বিচ্ছেদ বা পার্থক্য (separation) দিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব। যে মেরুর সাপেক্ষে এই গতি সম্পন্ন হয় তার নাম অয়লার মেরু (Euler Pole) (চিত্র ৫০ক, খ)।
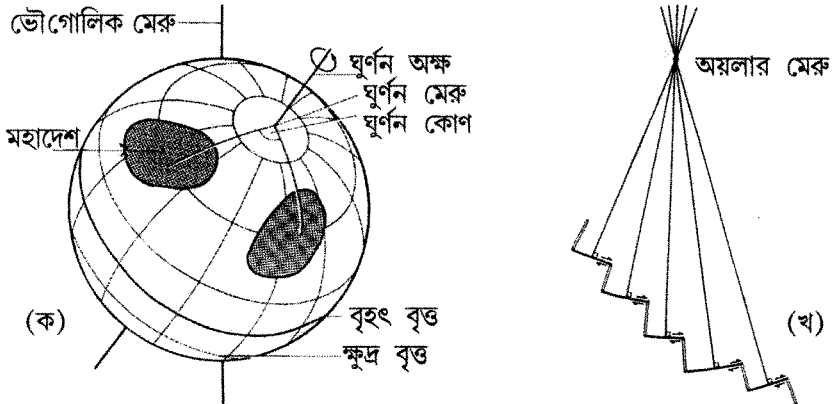
চিত্র ৫০ক) অয়লরের তত্ব। একটি ঘূর্ণন মেরুর সাপেক্ষে পৃথিবীর একটি মহাদেশের চলনকে কিভাবে একটি ঘূর্ণন কোন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় চিত্রে তাই দেখান হয়েছে।

চিত্র ৫০খ) একটি প্রসারণশীল শিরার পরিবর্তী চ্যুতির অফ্‌সেট থেকে অয়লার মেরু নির্ধারণ।

জ) পৃথিবী পৃষ্ঠের অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি বলয় ও ভূকম্পন বলয়গুলি এই তিন ধরণের প্লেটের সীমানা ও তাদের পারস্পারিক গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। স্বল্প গভীরতার ভূকম্পন থেকে সুগভীর উৎসের ভূকম্পনগুলি অভিসারী প্লেট সীমানায় যথাক্রমে সমুদ্র সীমা থেকে মহাদেশের দিকে সুনির্দিষ্টভাবে সজ্জিত থাকে। অপসারি প্লেট সীমানাগুলি সাধারণভাবে অল্প গভীর উৎসের ভূকম্পনের জন্ম দেয়। পরিবর্তী চ্যুতি সীমানার ভূকম্পন, প্রাবল্যের দিক থেকে ভয়ঙ্কর হতে পারে।

ঝ) পরস্পর সংলগ্ন প্লেটের আপেক্ষিক গতির ঈঙ্গিত দিকের (relative velocity vector) উপর প্লেট সীমানাগুলির স্থায়ীত্ব নির্ভর করে। যদি কোন প্লেট সীমানা অস্থিত (unstable) হয় তবে তা হবে একটি ক্ষণিকের ব্যাপার যা অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে একটি স্থিতিশীল সীমানায় এসে পৌঁছবে। যেখানে তিনটি প্লেটের সংযোগ হয় তাকে triple junction বলে। এই জাঙ্কশনে প্লেটগুলির পারস্পরিক অবস্থানের উপর triple junction-এর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। প্লেটগুলির আপেক্ষিক গতির সঙ্গে কখনো কখনো triple junction-এর জ্যামিতিক আকৃতির পরিবর্তন হয় আবার কখনও হয়ও না। যখন এই সব junction-এ প্লেটের জ্যামিতিক আকৃতি অপরিবর্তিত থাকে তখন সেইসব triple junction গুলি স্থিতিশীল (stable) হয়। আর যখন প্লেটগুলির গতির সঙ্গে triple junction-এর পরিবর্তন ঘটে তখন তা হয়ে পড়ে অস্থিত (unstable) (চিত্র ৫১)।
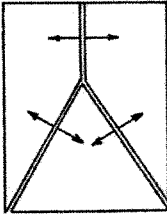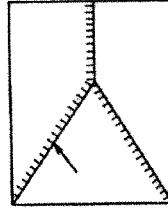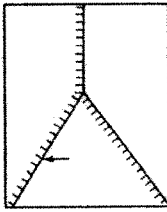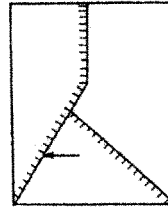
চিত্র ৫১ ক-ট্রিপল্ জাঙ্কশন শৈল শিরা দিয়ে বিভক্ত। খ, গ ও ঘ-এর প্রত্যেকটিতে তিনটি প্লেটই সামুদ্রিক খাত দিয়ে বিভক্ত। খ, গ ও ঘ-এ স্লিপ প্লেনের অভিমুখই ট্রিপল জাঙ্কশনের স্থিতিশীলতা নির্ধারক। ক ও খ স্থিতিশীল ট্রিপল জাঙ্কশন ও গ, ঘ অস্থিত ট্রিপল জাঙ্কশন। বিপরীত মুখী তীরগুলি শিরা অক্ষের প্রসারণ নির্দেশক। দাতের মত দাগকাটা রেখাগুলি সমুদ্রখাতের অঞ্চল সহ তাদের অধোমুখী হওয়ার দিক নির্দেশ করছে। তীর চিহ্নগুলি স্লিপ-এর দিক নির্দেশক।

ঞ) অ্যাসথেনোস্ফিয়ারের মধ্যবর্তী তাপ তড়িৎ প্রবাহজাত আবর্ত (thermo-electric convective cell)এর উপরিস্থিত ভাসমান শিলামণ্ডলের প্লেটগুলির গতিশক্তির উৎস। বিজ্ঞানীরা প্লেট টেকটনিক্স্ তত্বের সাহায্যে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত গাঠনিক বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্লেট টেকটণিক্স্ ও প্রাচীন ভাঁজ পর্বতমালার সৃষ্টি

প্লেট টেকটণিক্স্ তত্বের বিশ্লেষণে আমরা জানতে পেরেছি যে মহাদেশীয় শিলামণ্ডলের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া একটি চিড় বা ফাটল তাকে দুটি মহাদেশীয় শিলামণ্ডলে বিভক্ত করে। হিসাবে দেখা গেছে যে ১৫ কোটি বছরে সেই ফাটলের সাপেক্ষে ঐ দুটি মহাদেশীয় শিলামণ্ডল পরস্পরের থেকে দূরে সরে গিয়ে ৬০০০-৭০০০ কিমি প্রশস্ত আটলান্টিকের মত একটি মহাসাগরের জন্ম দিতে পারে। এরপর ঐ মহাসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ম্যান্টেল থেকে উদ্গিরিত লাভার সঞ্চয়নে নতুন একটি শৈল শিরার সৃষ্টি হয়। মধ্য সাগরীয় ত্বকে এদের অবস্থানের জন্য এদের মধ্য-সাগরীয় শিরা (mid oceanic ridge) বলে। এই শিরা অঞ্চলে টান-প্রসারণ বল কার্যকারী থাকে। মহাসাগরের প্রান্তে বা মহাদেশের সীমানায় এসে এই টান-প্রসারণ বল সংকোচন বলে রূপান্তরিত হয়। সেখানে মহাসাগরীয় ত্বকের প্লেট মহাদেশের তলায় প্রায় ৪৫° কোণের একটি বলয় ধরে অধোগামী হয়ে সমুদ্রত্বকে একটি গভীর খাতের সৃষ্টি করে। আর এই সামুদ্রিক প্লেটের অধোগমন বরাবর এই প্লেটের চ্যুতি অঞ্চল ধরে ভূকম্পন উৎসের সৃষ্টি হয় যা Benioff zone নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

প্লেট টেকটনিক্স্ আমাদের দেখিয়েছে যে দুটি মহাদেশীয় শিলামণ্ডলের সংকোচনশীলতার অনিবার্য পরিনাম সংঘর্ষ (collision) যা থেকে পৃথিবীর ভাঁজ পর্বতমালার সৃষ্টি। পুরাভৌগোলিক বিচারে আজ থেকে ১৮ কোটি বছর আগে ভারত, অ্যান্টার্কটিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল, wedge আকৃতির প্যানজিয়া নামের এক অতিকায় মহাদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এশিয়ার সঙ্গে ভারতের দূরত্ব তখন ৬০০০-৭০০০ কিমি। এর পরবর্তী পর্যায়ে ভারত মেরু সঞ্চারের মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ৩০ ডিগ্রী কোণ করে ৬০০০ কি.মি অনুবাহিত হয়। এর ফলে এশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তের মহাসাগর টেথিস্ সঙ্কুচিত হতে থাকে ও টেথিস্ মহাসাগরের ত্বক এশিয়ার মহাদেশীয় শিলামণ্ডলের নিচে অধোগামী হতে থাকে। আজ থেকে ৫ কোটি বছর আগে ভারত ভূখণ্ডের, এশিয়ার ভূখণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়। এই সংকোচনশীল চাপে সৃষ্টি হয় হিমালয় আর তার শিলামণ্ডলের নিচে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় টেথিস্ মহাসাগরের ভূত্বক। হিমালয়ের মত অন্য সব ভাঁজ পর্বতের শিলাস্তরেও সামুদ্রিক শিলাস্তরের সমষ্টির (ওফিওলাইট পর্যায়ক্রম) সন্ধান পাওয়া যায়। দুটি মহাদেশের মধ্যবর্তী কোনও সমুদ্র ত্বকের সাপেক্ষে, সংঘর্ষের ফলে ওফিওলাইট সম্বলিত ভাঁজ পর্বতের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

প্লেট টেকটণিক্স্ তত্বের আলোকে আমরা পৃথিবীর আজ থেকে ২০ কোটি বছর পর্যন্ত ভূসংক্ষোভ-জাত গাঠণিক ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু পৃথিবীর মোট ৪৫০

কোটি বছরের ইতিহাসের তুলনায় এই ২০ কোটি বছর নিতান্তই কম সময়। মার্কিন বিজ্ঞানী উইলিয়াম আর ডিকিনসন (চিত্র ৫২) (William R. Dickinson) ২০ কোটি বছরের থেকে পুরোনো পৃথিবীর গাঠণিক ব্যাখ্যার জন্যও বিভিন্ন সময়ের পরিসরে বারেবারে প্লেট টেকটণিক্স্ তত্ত্বের ব্যবহার করেছেন। ঐ সময়কার প্লেটগুলির সংখ্যা ও তাদের চলনের দিকগুলি অবশ্যই বর্তমান প্লেট সংখ্যা ও চলনের থেকে আলাদা ছিল কারণ তখন পৃথিবীর ত্বক ছিল অনেক পাতলা ও পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপও ছিল অনেক বেশী। তখনকার সম্ভাব্য প্লেট টেকটণিক্স্ দিয়ে তিনি পৃথিবীর বহু প্রাচীন ভাঁজ পর্বতের জন্ম রহস্য উদঘাটন করেছেন।
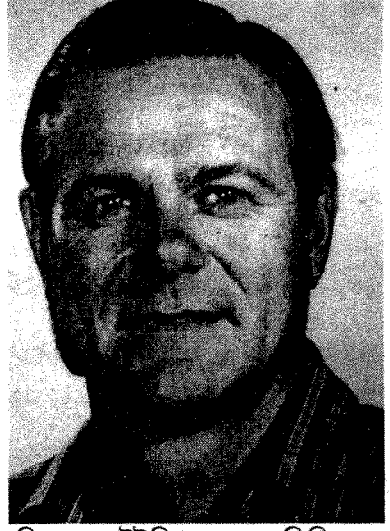
চিত্র-৫২: উইলিয়াম আর ডিকিনসন

১৯৩১-এ আমেরিকার নেম্ভাইল টেনিসিতে ডিকিনসনের জন্ম। মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকেই ইনি ভূ-গাঠণিক বিষয়ে আকৃষ্ট হন। পূর্বতন প্লেট টেকটণিক্সের সাহায্যে প্রাচীন পর্বতমালার সৃষ্টির ইতিহাস উন্মোচনে এঁর গবেষণা যুগান্তকারী।
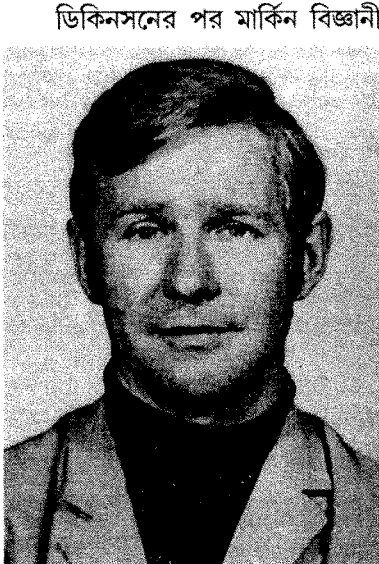
ডিকিনসনের পর মার্কিন বিজ্ঞানী জন এফ্ ডেওয়ে (চিত্র ৫৩) (John F. Dewey) প্রাচীন প্লেট টেকটণিক্স্ মডেলের সাহায্যে আল্পস্ ও অ্যাপালাশিয়ান পর্বতমালার সৃষ্টির ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে যে কোন পর্বতমালার সৃষ্টির পিছনে বহুবিধ প্রক্রিয়া কার্যকারী থাকে, কোন একক প্রক্রিয়া তাদের সৃষ্টি করতে পারে না। অ্যাপালাশিয়ান পর্বত তৈরির পিছনেও Ordovician যুগের পর্বতমালার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী সামুদ্রিক দ্বীপমালা সৃষ্টির ইতিহাস ও Devonian যুগের ব্যাপক সংঘর্ষ জড়িত।

চিত্র-৫৩: জন এফ্ ডেওয়ে

প্লেট টেকটণিক্স্রে উপর ডেওয়ের গবেষণা এই মডেলের বহু জটিল সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেছে। পৃথিবীর শিলামণ্ডলীয় প্লেটগুলির অবস্থান, সীমানা ও আপেক্ষিক গতি (চিত্র ৪৮) নিরূপণ করে তাদের মধ্যবর্তী বিভিন্ন প্রকারের সীমানাগুলির অবস্থান ও অস্তিত্বের উপর

তাঁর মডেল অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছে। এছাড়া ডেওয়ে, অয়লারের মেরুর সাপেক্ষে প্লেটগুলির ঘূর্ণনের ফলে অক্ষাংশ ধরে তাদের আপেক্ষিক গতির তারতম্য হিসাব করে দেখিয়েছিলেন।

১৯৭০-এ একটি গবেষণাপত্রে ডিওয়ে দেখালেন যে অভিসারী প্লেটের সীমানায় সংঘর্ষের প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং মহাদেশীয় শিলামণ্ডলের সংঘর্ষ কোন ব্যাতীক্রমী ব্যাপার নয় বরং তা অনিবার্য। তাঁর মতে প্লেটের অবস্থান ও গতি অপরিবর্তিত থাকলে একদিন গ্রীস ও তুরস্কের সংঘর্ষ অনিবার্য।

উইলসন্ চক্র ও মহাসাগরের জীবনাবর্ত্ত

প্লেট টেকটনিক্স্ তত্ত্বের সাহায্যে আমরা জানতে পেরেছি যে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে মহাসাগরের সৃষ্টি ও তার সমাপ্তির ইতিহাস পৃথিবীর বুকে গাথা আছে। বিভিন্ন সাগর-মহাসাগরের বয়ক্রম হিসাব করে আমরা জেনেছি যে পৃথিবীর বুকে এরা ভ্রূণ অবস্থা থেকে শৈশব, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সীমা পেরিয়ে চরম বার্ধক্যের শেষে আবার সম্পূর্ণভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জীব জগতের জীবনাবর্তের মত সাগর-মহাসাগরেরও জন্ম-মৃত্যু চক্র বর্তমান। J.F. Dewey ও K.C.A. Burke ১৯৭৪-এ মহান সমুদ্র বিজ্ঞানী J.T. Wilson-এর প্লেট টেকটণিক্স্-এর উপর অসাধারণ গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবে এই চক্রের নামাকরণ করেন 'উইলসন্ চক্র' (Wilson cycle)। চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। চিত্র ৫৪(ক)-এ দেখান হয়েছে পৃথিবী পৃষ্ঠে ক-খ ও গ-ঘ দুটি মহাদেশীয় অঞ্চল আর এদের মধ্যবর্তী ক-ঘ ও খ-গ মহাসাগরীয় অঞ্চল যাদের মধ্যে ক-ঘ একটি সম্প্রসারণশীল মহাসাগর ও খ-গ একটি সংকোচনশীল মহাসাগর।

এর পরবর্তী পর্যায়ে চিত্র ৫৪(খ)-এ আমরা দেখি যে মহাদেশীয় অঞ্চল ক-খ ও গ-ঘ পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে সংঘর্ষে আসায় ঐ অঞ্চলের মধ্যবর্তী মহাসাগর সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়েছে। এরই সঙ্গে সঙ্গে ক-ঘ সমুদ্র অঞ্চল সম্প্রসারিত হয়ে ক ও ঘ অঞ্চলে মহাদেশের নিচে অধোগামী হওয়ার প্রথম পর্যায়ে এসেছে ও তার সঙ্গে খগ-ঘ মহাদেশীয় অঞ্চলের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে (চিত্রে খ'গ') একটি প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রস্থ (rift) বা ফাটল অঞ্চলের সৃষ্টি করেছে।

মহাদেশীয় ত্বক ও মহাসাগরীয় ত্বকের চলনশীলতার ফলে চিত্র-৫৪(খ)-এ দেখা যাচ্ছে কখগঘ একটি অতিকায় মহাদেশে (supercontinent) পরিণত হয়েছে আর এরই সঙ্গে খ' ও গ' একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাওয়ায় এদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি নতুন সম্প্রসারণশীল সমুদ্রের সৃষ্টি হচ্ছে চিত্র-৫৪(গ)। এই পরিবর্তিত অবস্থায় ক-খ' ও গ'-ঘ দুটি নতুন মহাদেশীয় অঞ্চল আর এদের মধ্যবর্তী ক-ঘ একটি সংকোচনশীল মহাসাগর। এই মডেলের সাহায্যে বর্তমান পৃথিবীর মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

চিত্র ৫৪ (ক) তে ক-ঘ অঞ্চল বর্তমান পৃথিবীর সম্প্রসারণশীল আটলান্টিক মহাসাগর ও খ-গ অঞ্চল সংকোচনশীল প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে তুলনীয়। চিত্র ৫৪ (খ) তে খ-গ দুটি মহাদেশের সংঘর্ষ অঞ্চল যা হিমালয় সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয়। এই পর্বতমালার নিচে মহাসাগরের অবলুপ্তি টেথিস্ মহাসাগরের অবলুপ্তির সঙ্গে তুলনীয়। খ́-গ́ অঞ্চল পূর্ব আফ্রিকার গ্রস্থ উপত্যকা অঞ্চলের কথা মনে করিয়ে দেয়। চিত্র ৫৪ (গ)-এর ক-ঘ অঞ্চল ক্ষয়িষ্ণু প্রশান্ত মহাসাগর ও খ́-গ́ নতুন সৃষ্টির পর্যায়ে রেড্ সি বা লোহিত সাগরের সঙ্গে তুলনীয়।
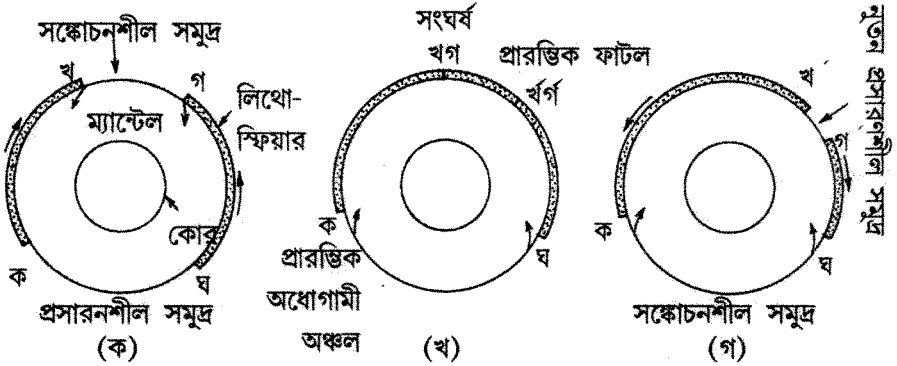
চিত্র-৫৪ উইলসন চক্র : মহাসাগর ও মহাদেশের জন্ম-মৃত্যু সহ এদের পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

ক) প্রসারণশীল সমুদ্র ক-ঘ ও সংকোচনশীল সমুদ্র খ-গ দিয়ে মহাদেশ ক-খ ও গ-ঘ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

খ) মহাদেশ ক-খ ও গ-ঘ এর সংঘর্ষে সংকোচনশীল সমুদ্র খ-গ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হযেছে। এর সঙ্গে ক ও ঘ তে সমুদ্র মহাদেশর নিচে অধোগামী হয়েছে।

গ) অতিকায় মহাদেশ কখগঘ ভেঙে গিয়ে ক-খ́ ও গ́-ঘ হিসাবে দুটি নতুন মহাদেশে বিভক্ত হয়েছে এবং মধ্যবর্তী খ́-গ́ একটি নতুন প্রসারণশীল সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে ক-ঘ সমুদ্র সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ হয়েছে। (ফিলিপ্ কিয়েরে ও এফ্ জে ভাইন ১৯৯০ থেকে সংগৃহীত)।

উইলসন্ চক্র আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে যে মহাদেশ ও মহাসাগর সময়ের সঙ্গে নিজেদের স্থান পরিবর্তন করে। নতুন নতুন মহাদেশ ও মহাসাগরের এই স্থান পরিবর্তনের পালা বা চক্রাবর্ত ততদিনই চলতে থাকবে যতদিন এদের নিচের অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার স্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ-জাত তাপশক্তির প্রভাবে শিলামণ্ডলীয় (Lithospheric) প্লেটগুলি চলমান থাকবে।

পরিচ্ছেদ-১৯

আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান ও ভারত

মহাসমুদ্র ও সমুদ্র গবেষণায় পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য দেখা যায়। এর পেছনে কারণ হলো সমুদ্র গবেষণার জন্য এই দুই শ্রেণীর দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও প্রযুক্তির উদ্ভাবণ ও তার প্রয়োগের তারতম্য। উত্তর সাগর, বাল্টিক সাগর, উত্তর আটলান্টিক ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের পার্শ্ববর্তী দেশগুলি উন্নত। তাই এইসব দেশের সংলগ্ন সমুদ্রগুলির বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রাচুর্যও বেশী। বিপরীত দিকে দক্ষিণের মহাসাগরগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল উন্নয়নশীল দেশগুলির দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হওয়ায় ঐ সব মহাসাগরগুলির বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য অপ্রতুল। ভারত মহাসাগরের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত অভিযানও তাই একই ভাবে বহু বছর পিছিয়ে ছিলো। এই মহাসাগরের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয় ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সালে। এই সময় রাষ্ট্রপুঞ্জের নজরদারীতে আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান (International Indian Ocean Expedition) পরিচালিত হয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশ এই অভিযানে সমুদ্র গবেষণা জাহাজ সহ উন্নত ধরণের পরীক্ষাগারের সহায়তা লাভ করে।

এই অভিযানে ভূপদার্থ বিষয়ক গবেষণায় ভারত মহাসাগরের যে গভীরতাসূচক (bathymetric) চার্ট তৈরি হয় তার উৎকর্ষ ইতিপূর্বে সংঘটিত গ্লোমার চ্যালেঞ্জার (Glomar Challenger) ও এইচ্ এম্ এস্ চ্যালেঞ্জার (Challenger) অভিযানের কাজের সঙ্গে তুলনীয় তো বটেই বহুক্ষেত্রে আরো উন্নতমানের। ভারতসহ দশটি দেশের ৩৯টি সমুদ্র গবেষণা জাহাজ ও বিজ্ঞানীরা এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করে। সমুদ্রতলের স্রোত, তাপমাত্রা, গভীর সমুদ্রের তরঙ্গ সৃষ্টি ও তার প্রভাব, খনিজ-সমৃদ্ধ উষ্ণ-প্রস্রবণ ও জীবন্ত প্রাণীর সম্ভার প্রভৃতি নানা বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ভান্ডার পূর্ণ হতে থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলস্বরূপ পাঁচটি অ্যাট্লাসে সমুদ্র পৃষ্ঠের জলবায়ু থেকে সমুদ্র জলে প্রবাহ-তাড়িত ক্ষুদ্র জীব ও উদ্ভিদ (zooplankton ও phytoplankton)-সহ সামুদ্রিক ভূপদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়। আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের মৎস্যচাষ ও উৎপাদনের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ও উপকূলবর্তী প্রতিতটীয় (offshore) পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুতের অবস্থান সম্বন্ধে অনেক স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। এরপর ভারতের ন্যাশনাল ইন্স্টিটিউট অফ্ ওশেনোগ্রাফির নিজস্ব উপকূলীয় গবেষণা জাহাজ 'সাগর সূক্তি' (Sagar Sukti) গভীর সমুদ্র অভিযানের উপযুক্ত 'সাগরকন্যা' ও 'গবেষিণী' আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগরের

উপকূলীয় অঞ্চলের মহীসোপান, মহীঢাল সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহু তথ্য সংগ্রহ করে। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের উপকূলীয় অঞ্চল সংক্রান্ত গবেষণাও এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। ১৯৭৩-এ ভারতের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন (Oil and National Gas Commission, ONGC) তাদের নিজস্ব জাহাজ 'অন্বেষক'-এর (Anveshak) সাহায্যে উপকূলীয় অঞ্চলের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানে তৎপর হয়। আধুনিক ভূ-পদার্থ গবেষণার উপযুক্ত যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত 'অন্বেষক' প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। ও.এন্.জি.সি. ছাড়াও বর্তমানে অনেক বহুজাতীক সংস্থা ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে বৃহৎ নদীগুলির মোহানা বা ব-দ্বীপ অঞ্চলে ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাসের অনুসন্ধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। এসব সত্ত্বেও ভারতের বিশাল তটীয় ও উপকূলবর্তী অঞ্চলের সম্ভাব্য পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রকৃত ভান্ডার আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন হয়নি।

সমুদ্র বিজ্ঞানের গবেষণায় ভারত

১৯৮১ সালে ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ ওশেনোগ্রাফির (National Institute of Oceanography) সমুদ্র গবেষণা জাহাজ আর. ভি. গবেষিণী (R.V. Gaveshani) ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী আরব সাগরের তলদেশ থেকে প্রথম ম্যাংগাণিজ নুড়ি (Manganese Nodule) সংগ্রহ করে। এরপর এই গবেষণাগারের উদ্যোগে মধ্য ভারত মহাসাগর (Central Indian Ocean Basin) থেকে ম্যাংগাণিজ নুড়ি তোলার একটি বৃহৎ পরিকল্পনা গৃহিত হয়। ১৯৮১-র জুলাই মাসে ভারত সরকারের সমুদ্র উন্নয়ন বিভাগ (Department of Ocean Development) সৃষ্টি হওয়ার পর এই পরিকল্পনা আরও সমৃদ্ধ হয়। স্থির হয় যে মধ্য ভারত মহাসাগরের যে অঞ্চলে নুড়ির পরিমান প্রতি বর্গকিলোমিটারে পাঁচ কেজির বেশী, ও যেখানে নুড়িগুলিতে নিকেল, তামা ও কোবাল্ট-এর সম্বলিত পরিমান ২ শতাংশের বেশী হবে সেখানেই প্রথম ম্যাংগাণিজ নুড়ি খনন ও উত্তোলনের কাজ গ্রহণ করা হবে। সেইমত মধ্য ভারত মহাসাগরের ৩০০,০০০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে ১৩৩৫ মিলিয়ন টন ম্যাংগানিজ নুড়ির সম্ভার চিহ্নিত হয়। ১৯৮২-র এপ্রিলে ভারত ঐ অঞ্চলে পথিকৃত অনুসন্ধানীর মর্য্যাদা পাওয়ার পর ১৯৮৪-র জানুয়ারী ওই পথিকৃৎ অঞ্চলে কাজের জন্য আর্ন্তজাতিক সংস্থা প্রেপকম (Prepcom) এর নিকট আবেদন করে। ১৯৮৭-র অগাষ্ট মাসে ভারতই প্রথম মধ্য ভারত মহাসাগরে ১৫০,০০০ বর্গ কিমি পথিকৃৎ অঞ্চলে (Pioneer Area) সম্পূর্ণ এককভাবে ম্যাংগানিজ নুড়ি খনন ও উত্তোলনের অধিকার লাভ করেছে।

এরপর ভারতের সমুদ্র গবেষণা জাহাজ ও.আর.ভি. সাগরকন্যা-র (চিত্র-৫৫) (ORV Sagar Kanya) সংযোজন হয় ১৯৮৪তে। ২০০০ সাল পর্যন্ত এই গবেষণা জাহাজ ভারত মহাসাগরে মোট ১৬টি অভিযান চালিয়ে ভারত মহাসাগর তথা বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের বহু অজানা তথ্য সংগ্রহ করেছে। এইসব সমুদ্র অঞ্চলে উপাত্ত বয়া (data buoy)

স্থাপন করে সমুদ্রের আবহাওয়া বিষয়ক বহু তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও বিজ্ঞানীরা 'সাগরকন্যার' সাহায্যে আরব সাগরের নাইট্রোজেনের জৈব ভূরসায়নিক (Bio-geochemical) চক্রের পরীক্ষা, উপকূল অঞ্চলে জল-স্থল সন্ধি অঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করেছে। ভারত মহাসাগরের জটিল অঞ্চলগুলির গাঠণিক (structural) ও সমুদ্র চৌম্বকত্বের গবেষণায় 'সাগরকন্যা'কে কাজে লাগিয়ে ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অফ্ ওশেনোগ্রাফীর বিজ্ঞানীরা গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।
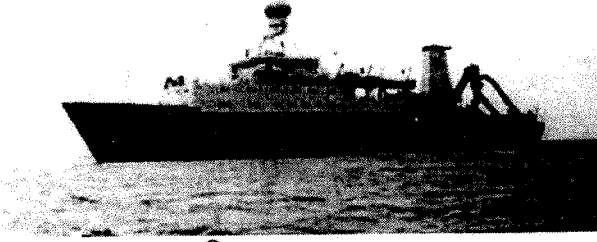
চিত্র-৫৫: সাগরকন্যা

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের (Geological Survey of India) সামুদ্রিক শাখা (Marine Wing) তাদের নিজস্ব গবেষণা জাহাজ আর.ভি. সমুদ্রমন্থন-এর (R.V. Samudra Manthan) মাধ্যমে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বহু দৃষ্টান্তমূলক গবেষণা চালিয়েছে। এই সংস্থার সমুদ্র বিজ্ঞানীরা 'সমুদ্র মন্থন'-এর সাহায্যে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল ছাড়াও লাক্ষাদ্বীপ ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপ সমুহের উপকূলীয় পলির চরিত্র, সামুদ্রিক অগ্ন্যুৎপাত-জাত ভলকানিক্ টেফ্রা (Volcanic tephra) প্রভৃতির গবেষণায় বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছে। ভারতের বিশাল উপকূলের অর্ন্তভূক্ত একস্ক্লুসিভ্ ইকোনমিক অঞ্চল-এর (Exclusive Economic Zone, EEZ) বিভিন্নস্থানের নামাকরণ মানচিত্র তৈরি করে এই সংস্থা ঐ সব অঞ্চলে গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিতে প্রভূত সহায়তা করেছে। এই সংস্থার আর একটি গবেষণা জাহাজ আর ভি সমুদ্র সৌধিকামা (R.V. Samudra Saudhikama), কন্যাকুমারী থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূল অন্তর্গত কোলানকড় (Kollankod) পর্যন্ত অঞ্চলের প্রকীর্ণকের (Placer deposit) পরিসংখ্যান দিয়েছে। এইসব প্রকীর্ণকের মধ্যে ইল্‌ম্যানাইট, (Ilmenite), জারকন (Zircon), মোনাজাইট (Monazite), সিলিম্যানাইট (Sillimanite) ও গারনেট (Garnet) মণিক হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাগর নিধি—ভারতের সর্বাধুনিক সমুদ্র গবেষণা জাহাজ

ভূতাত্ত্বিক সমুদ্রবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ভারতের নবীনতম সংযোজন ভারত সরকার ক্রীত বহু উদ্দেশ্যসাধক গবেষণা জাহাজ 'সাগর নিধি'। গভীর মহাসাগরীয় ত্বক থেকে মণিক সংগ্রহের উপযোগী ভেসেল্ 'সাগর নিধি' তৈরি হয়েছে ইটালীর ফিনক্যান্টেরি কোম্পাণিতে। চেন্নাই-এর ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অফ্ ওশেন টেক্‌নোলজির (National Institute of Ocean

Technology) তত্ত্বাবধানে থাকা ২৩২ কোটি টাকা মূল্যের এই ভেসেল্ ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সম্পত্তি। 'সাগর নিধির' সাহায্যে মধ্য ভারত মহাসাগরীয় ত্বকে অবস্থিত ম্যাংগানিজ নুড়ি সহ (চিত্র ৫৬) অন্যান্য মণিক ও ধাতব পদার্থ (নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি) ড্রেজারের সাহায্যে খনন করে তুলে আনা সম্ভব হবে।

চিত্র-৫৬: সমুদ্রতল থেকে ম্যাঙ্গানিজ নুড়ি উত্তোলন

আগেই বলা হয়েছে ভারতই প্রথম দেশ যে মহাসাগরীয় ত্বকের স্থাবর সম্পত্তির উপর পূর্ণ কতৃত্বের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের থেকে পাওয়া অধিকার বলে ১৯৮৭ সালে মধ্য ভারত মহাসাগরীয় ত্বকে ১,৫০,০০০ বর্গ কিমি অঞ্চলে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের জন্য বিনিয়োগ করে। যেহেতু বিভিন্ন ধাতুর দাম বিশ্ব বাজারে বেড়েই চলেছে, সেহেতু নতুন প্রযুক্তিতে তৈরি অত্যাধুনিক 'সাগর নিধি'-র সাহায্যে অদূর ভবিষ্যতে মধ্য ভারত মহাসাগরীয় ত্বকের এই সব ধাতুকে উত্তোলন করা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভ জনক হবে বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা।

সাগরনিধিই ভারতের প্রথম গবেষণা ভেসেল্ যাতে এমন winch ও কেবল্-এর ব্যবস্থা আছে যার সাহায্যে ৬ কিমি গভীর মহাসাগরীয় ত্বক থেকে এক বারে ৬০টন ধাতববস্তু উত্তোলন করা সম্ভব। এছাড়া ২.৫ মিটার উচ্চতার তরঙ্গবন্ধুর সমুদ্রেও কোন নির্দিষ্ট স্থানের ৫ মিটারের মধ্যে সাগর-নিধি স্থির হয়ে থাকতে পারবে। এ ছাড়াও সাগর নিধিতে থাকবে ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট (desalination plant) যার সাহায্যে সমুদ্রের নোনাজলকে লবনমুক্ত করা যাবে আর চালানো হবে গভীর সমুদ্রে বিভিন্ন রকম পর্যবেক্ষণ।

ভারত মহাসাগরের গবেষণা ও ডঃ এস্ জেড্ কাশিম

সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণায় ভারতের বহু সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বহু বিজ্ঞানী আজ বিভিন্নভাবে ব্যাপৃত। কিন্তু আজকের এই অগ্রগতির প্রথম সোপান যিনি তৈরি করেছিলেন তিনি অগ্রজ বিজ্ঞানী ডঃ এস্ জেড্ কাশিম। জীবনের বৃহত্তম অংশ এই বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ভারত মহাসাগরের গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ১৯৮৮-তে প্রকাশিত ভারত মহাসাগরের ম্যাংগানিজ নুড়ির অবস্থান ও সম্ভাব্য খননস্থানের উপর তাঁর সুদীর্ঘ রচনা "From the first nodule to the first mine site-An account of the Polymetallic Nodule Project DOD" ভারত মহাসাগরের খনিজ সম্ভারের একটি মূল্যবান দলিল। ভারতের পক্ষে তুষারাবৃত মহাদেশ অ্যানটার্কটিকায় গবেষণার প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানীও ডঃ কাশিম। দেশী ও

আর্ন্তজাতিক স্তরে প্রকাশিত তাঁর শতাধিক বিজ্ঞান প্রবন্ধ ভারত মহাসাগরের গবেষণায় ভাস্বর হয়ে আছে। বহু সম্মান ও উপাধিতে ভূষিত ডঃ কাশিম ১৯৯৯-তে Oceanology International-99 Panific Rim Lifetime Award-এ সম্মানিত হন।

ভারত মহাসাগরের ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় এন আই ও-র ডঃ হাসান নাসিম সিদ্দিকি ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের অবদান

ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অফ্ ওশেনোগ্রাফির (NIO) প্রাক্তণ অধিকর্তা ডঃ হাসান নাসিম সিদ্দিকি (Hassan Naseim Siddiquie) ছিলেন ভারত মহাসাগরের ভূতাত্ত্বিক গবেষণার একজন পথিকৃৎ বিজ্ঞানী। ১৯৬০-৮০-র দশকে ভারত মহাসাগরের উপকূল থেকে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ৩০টি মূল্যবান গবেষণা পত্র প্রকাশের মধ্যে দিয়ে ইনি এক অসাধারণ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে গেছেন। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের পলল ও মণিক সম্ভারের বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াও আরব সাগর ও বঙ্গোপোসাগর সহ ভারত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবক্ষেপণ প্রক্রিয়া ও পলল প্রকৃতির উপর তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। লাক্ষা দ্বীপের কারাভাতি (Kavarati) ও কালপেণি (Kalpeni) লেগুনের ক্যালকেরিয়াস্ বালির (Calcareous sand) অবক্ষেপন প্রক্রিয়া ও তাদের প্রকৃতির বিষদ বিবরণও আমরা ডঃ সিদ্দিকি ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণায় জানতে পেরেছি। আর ভি অনুসন্ধানী (R. V. Anusandhani) গবেষণা জাহাজে ভারত মহাসাগর পরিক্রমা করে সিদ্দিকি ও তাঁর সহকর্মীরা ভারত মহাসাগরের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধিয় নানান বিষয়ের উপর যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানে তার মূল্য অপরিসীম।

এছাড়া NIO-র সামুদ্রিক রসায়ণ বিভাগের বিজ্ঞানীদের মধ্যে ডঃ রবীন সেনগুপ্ত ও তাঁর সহকর্মীরা ভারত মহাসাগরের পলল ও রাসায়ণিক ভূবিজ্ঞানের বিষয়ে ও ঐ সংস্থারই সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞান বিভাগের বিজ্ঞানীরা ভারত মহাসাগরের ত্বকের গঠন ও সামুদ্রিক চৌম্বকত্বের বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করে প্রভূত নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন।

অ্যানটার্কটিকা অভিযান ও পথিকৃৎ ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানীদের অবদান

১৯৮১ তে ভারত সরকারের সমুদ্র উন্নয়ন দপ্তর (Department of Ocean Develoment) সৃষ্টির পর ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সমুদ্র বিষয়ক গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়। এই দপ্তরের কার্যক্রমে ভারত মহাসাগরের ভৌত, রসায়ণিক, জৈব ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা ছাড়াও দক্ষিণ মেরুর অচেনা অজানা তুষারাবৃত মহাদেশ অ্যানটার্কটিকার উপর গবেষণাকেও অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছিল। সেখানে স্থায়ী ষ্টেশন তৈরি করে গবেষণার পথ প্রশস্ত করাও ছিল এই দপ্তরের কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত একটি বিষয়।

এই মহাদেশের দুঃসাহসীক অভিযানে পুরুষ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সহযোগী হয়েছিলেন ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানীরা। মহিলা বিজ্ঞানীদের অংশ গ্রহণ ও গবেষণায় রহস্যাবৃত

পরিচ্ছেদ-১৯

অ্যান্টার্কটিকার বহু বিষয় আজ আমাদের গোচরে আর তাই সমুদ্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে এদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৩-৮৪ তে তৃতীয় অ্যানটার্কটিকা অভিযানে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ডঃ হর্ষ গুপ্তার (Dr. Harsh Gupta) নেতৃত্বে সেখানকার তুষার মহীসোপান (Ice Shelf) অঞ্চলে শীতকালীন বসবাসের উপযুক্ত ষ্টেশন 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী' প্রতিষ্ঠা করেন। এই অভিযানেই ভারতের দুই মহিলা বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা ডঃ সুদীপ্তা সেনগুপ্ত ও ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ ওশেনোগ্রাফির (NIO) জীব বিজ্ঞানী ডঃ অদিতি পন্থ এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করে অ্যানটার্কটিকার গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সঙ্গে সঙ্গে নতুন দিগন্তের সূচনা করেন।

এই দুই মহিলা বিজ্ঞানী এর পরবর্তীকালেও অ্যানটার্কটিকা অভিযানে দ্বিতীয়বারের জন্য অংশগ্রহণ করে অসামান্য কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। ডঃ পন্থ পঞ্চম ও ডঃ সেনগুপ্ত নবম অ্যানটার্কটিকা অভিযানে অংশ নেন। ১৯৮৭-৮৮ তে ভারতের সপ্তম ও অষ্টম অ্যানটার্কটিকা অভিযান সংঘটিত হয়। ওই সময়ে অ্যানটার্কটিকার সিমাচের (Schimacher) পর্বতমালার উপরে ভারতের দ্বিতীয় শীতকালীন ষ্টেশন 'মৈত্রী' স্থাপিত হয়। এই সময়ের পর থেকে এক দশক পর্যন্ত ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানীরা থেকে থেকে অ্যানটার্কটিকা অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। এই সময় ওই দুর্গম অঞ্চলে 'মৈত্রী'তে বসবাস করেই তারা গবেষণার কাজ চালান। অ্যানটার্কটিকা অভিযানগুলিতে ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার বিজ্ঞানীরা ছাড়াও যাদবপুর, দিল্লী, কলকাতা ও চেন্নাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক, গবেষকরা অংশ গ্রহণ করে অ্যানটার্কটিকা-সম্পর্কিয় বিজ্ঞান গবেষণার বিভিন্ন দিককে সমৃদ্ধ করেছেন।

তীব্রতম বাতাস ও শীতলতার মহাদেশ অ্যানটার্কটিকার গ্রীষ্মকালীন অভিযানগুলিতে মহিলা বিজ্ঞানীরা প্রধানত অংশগ্রহণ করেছেন কারণ শীতলকালীন অভিযানগুলিতে মহিলা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সেখানে বসবাস করা ছিল নানান কারণে দুঃসাধ্য। একমাত্র ব্যতিক্রম ১৯তম শীতকালীন অভিযানের (১৯৯৯-২০০১) সঙ্গী নতুন দিল্লীর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের ৫৩ বছর বয়সী ডাক্তার কানওয়াল ভিলকু (Kanwal Vilku), যিনি ঐ অভিযানে সমগ্র দলের স্বাস্থ্য পরিষেবার পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। ওই অভিযানের আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আন্তর্জাতিক সহযোগীতার মাধ্যমে পেরুর লিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোরা নেলীর (Nora Nelly) অংশগ্রহণ।

অ্যানটার্কটিকা অভিযানে ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার ডঃ সুদীপ্তা সেনগুপ্ত, ডঃ অদিতি পন্থ, ডঃ জয়া নেইথানি (Jaya Naithani) ও ডঃ কানওয়াল ভিলকুকে 'অ্যানটার্কটিকা এওয়ার্ড-এ (Antarctica Award) সম্মানিত করেন।

উপসংহার

সাগর-মহাসাগরের অনন্ত রহস্য মানুষ তার জ্ঞানের পরিধির সীমানা বাড়িয়েও কোন দিনই সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করতে পারবেনা। তাই সমুদ্রকে জানার জন্য দুঃসাহসিক অভিযান ও তাকে ঘিরে গবেষণার কাজও উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আজ আমরা জানি যে পৃথিবীর সমগ্র প্রাণী সম্পদের ৯০ শতাংশেরও বেশী প্রাণীর আশ্রয় স্থল এই সমুদ্র। এইসব প্রাণীরা বেঁচে আছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মহাসাগরীয় ত্বকের গভীরতম অঞ্চল ১১ কিমি-এরও গভীর মেরিয়ানা (১১২০০ মি) ও মিন্‌ডানাও খাত (১১৫২৪ মি) পর্যন্ত। সামুদ্রিক প্রাণীকূলের এই ব্যাপক সত্তার জানা থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির সূক্ষাতিসূক্ষ প্রাণী থেকে বৃহৎ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আবিষ্কারের খবর লিপিবদ্ধ হচ্ছে বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিনই। কত বিচিত্র এইসব প্রাণীদের জীবন যাপনের পরিবেশ! মহাসাগরীয় ত্বকের ঔদকতাপীয় ছিদ্রপথের (Hydrothermal vents) নিকটতম অঞ্চলেও বহু প্রাণী দিব্যি খাপ খাইয়ে বেঁচে আছে। সমুদ্রবিজ্ঞান গবেষণার জয়যাত্রার ফলে আমরা দেখছি যে ১৯৭০ দশকে যেখানে আমরা ১০ লক্ষ ৬০ হাজার সামুদ্রিক প্রাণীর খবর জানতাম আজ সেখানে আমরা এক কোটিরও বেশী সামুদ্রিক প্রাণী প্রজাতির সন্ধান পেয়েছি। সমুদ্র শুধু রত্নের আকর নয়, জীবজগতেরও এক বিশাল ভান্ডার। আমাদের জানা মোট ৩৩টি প্রাণীগোষ্ঠির (phylum) মধ্যে ৩২টি গোষ্ঠিকে পাওয়া যায় সমুদ্র অঞ্চলে আর এর মধ্যে ১৫টি গোষ্ঠি সম্পূর্ণভাবেই সামুদ্রিক যাদের স্থলে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

সমুদ্র গবেষণার কাজ মানুষকে চালিয়ে যেতে হবে তারই বাঁচার স্বার্থে। এর পরিবেশ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করতে না পারলে শুধু সামুদ্রিক জীবই নয় মানুষের অস্তিত্বও বিপন্ন হবে। আজকের বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতেও সমুদ্রের ভূমিকা অপরিসীম। সমুদ্রের সালোকসংশ্লেষক প্রবাহতাড়িত উদ্ভিদ সমূহ আবহাওয়ার কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পৃথিবীকে উষ্ণায়নের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য শক্ত খোলস সম্পন্ন মাছেরা (shellfish) মানুষকে বড় রকমের প্রোটিন সরবরাহে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সামুদ্রিক আগাছা (sea weeds) থেকে আজ আমরা খাদ্য, প্রসাধন, ডিটারজেন্ট, শিল্পে ব্যবহৃত লুব্রিক্যান্ট ও নানা রকম ওষুধের উপাদান সংগ্রহ করছি। যে সব দেহজ রসায়নিক পদার্থ সামুদ্রিক প্রজাতিকে অন্য প্রাণীদের শিকার হওয়া থেকে বাঁচায়, সেইসব রসায়ণিক পদার্থই মানুষকে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ভাইরাস, ও ব্যাক্‌টেরিয়া ঘটিত অসুস্থতা থেকেও বাঁচতে সাহায্য করে।

উপসংহার

জীবজগতের সম্পদ ছাড়াও সমুদ্র বহুবিধ মণিকের (mineral) ভান্ডার। উপকূলীয় সমুদ্র অঞ্চল থেকে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত এদের বিস্তার। সৈকত প্রকীর্ণক (beach placer) থেকে শুরু করে গভীর সমুদ্রের ম্যাংগানিজ্ নুড়ি (manganese nodule), কোবাল্ট ও নিকেলের স্তর, ও ব্ল্যাক্ স্মোকার-এর (Black smoker) সঙ্গে যুক্ত ধাতব সালফাইডের অবক্ষেপ (deposit) সবই আমরা পেয়েছি রত্নাকর সমুদ্রের প্রাকৃতিক পরিবেশে। ১৯৮০-র দশকে রেড্ সিতে বিশাল পরিমান ধাতুর অবক্ষেপের প্রাপ্তি ও পাপুয়া নিউগিনির উপকূলবর্তী (offshore) অঞ্চলে পাওয়া সোনা বাণিজ্যিক বিচারে সমুদ্র গবেষণার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।

শক্তির উৎস হিসাবে সমুদ্র আজ আমাদের কাছে গবেষণার এক বিশাল ক্ষেত্র। প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, কয়লা ও গ্যাস হাইড্রেটের অফুরন্ত ভান্ডারও সমুদ্র ও তার উপকূলীয় ব-দ্বীপ অঞ্চলেই লুকিয়ে আছে। সমুদ্র বিজ্ঞানীরা এই ভান্ডারকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে এদের আহরণ করেন। কোন দেশের সমৃদ্ধির স্বার্থে সমুদ্রবিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণা আজ অপরিহার্য্য। এই শতাব্দীতেই সামুদ্রিক শ্যাওলা (শৈবাল) থেকে নিষ্কাষিত বায়োডিজেল জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারে নিযন্ত্রকের ভূমিকায় দেখা দেবে।

মনে রাখা দরকার যে ব্যাপক উৎপাদান ও ব্যবহারের ফলে মহাদেশীয় অঞ্চলের সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে তাই আমাদের সমুদ্র গবেষণায় মনোনিবেশ না করে উপায় নেই। অফুরন্ত শক্তি ও সম্পদের ভান্ডার এই সমুদ্র। একে কাজে লাগাতে বিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে চাই উন্নত মানের প্রযুক্তির উদ্ভাবন।

সমুদ্রকে সম্পদ আহোরণের স্বার্থে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যাবে না। একে রাখতে হবে দূষণমুক্ত। উপকূলীয় সমুদ্র থেকে গভীর সমুদ্র আজ নানাভাবে দূষণ আক্রান্ত। মানুষের লোভ ও পারস্পারিক দ্বন্দ্বে সমুদ্র সম্পদ কখনো কখনো বিপন্ন। গভীর সমুদ্র থেকে উপকূলীয় অঞ্চলকে যথেচ্ছ ব্যবহারের হাত থেকে বাঁচাতে বিজ্ঞানীরা আজ "Coastal Zone Regution Act" ও "Law of the Sea" তৈরি করেছে। প্রতিটি মানুষ ও প্রতিটি দেশেরই এইসব নিয়ম মেনে চলার দায়বদ্ধতা আছে। সমুদ্রকে বাঁচাতে হবে, না হলে আমাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হবে—এটা বোঝার উপযুক্ত সময় কিন্তু এখনই। সর্বস্তরে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে বুঝতে ও বোঝাতে হবে যে উপকূলীয় অঞ্চল থেকে গভীর সমুদ্রত্বক্ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসম্য যেন কোনভাবেই বিঘ্নিত না হয়।

তথ্যসূত্র

১। Global Tectonics: P. Kearey & F.J. Vine (1996). Blackwell Science, 2nd Edition, p. 333.

২। Marine Geology: J. Kennett (1982) Prentice Hall, p. 813.

৩। Rediscovery of the earth: L. Motz (ed.) (1975). Van Nostrand Reinhold Company, p. 279.

৪। The ocean Basins: Their structures and Evolution: Open University Course Team (1989). Pergamon Press & The Open University, p. 171.

৫। Essentials of Oceanography: H.V. Thurman (1983) Chales E. Merrill Publishing Company, p. 374.

৬। Introductory Oceanography: J. Weisberg and H. Parish (1974). McGraw Hill Book Company, p. 320.

৭। The Sea Floor: E. Seibold and W.H. Berger (1993) Springer Verlag, p. 356.

৮। JOIDES Journal, V. 17.1991, V.26.2000, V.27.2001, V.29.2003, V.32.2006.

৯। http://en.wikipedia.org/wiki/james_cook.

১০। http://en.wikipedia.org/wiki/von_humboldt.

১১। http://www.academickids.com/encyclopedia/
index. php/william_dampier

১২। http://en.wickipedia.org/wiki/matthew_fontaine-maury.

১৩। http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/joides/index.htm.

১৪। http://www.sce.soton.ac.uk/others/csms/hmschall.html.

১৫। Marine Geology (2002) V. 188. Some early stages of marine geology: Autobiography of K.O. Emery.

১৬। Marine Geology: T.K. Mallick (2008) New Academic Publishers, New Delhi.

১৭। DOD Annual Report 1984-85.

১৮। News Letter (Marine Wing) G.S.I, V.12, No.2, 1996; V.15, No.1, 1999; V.18, No.1, 2004.

১৯। Depositional Systems: R.A. Davis, Jr. (1983). Prentice Hall, INC., Englewood Cliffs, New Jersey, p. 669.

২০। Earth History and Plate Tectonics: C.K. Seyfert and L.A. Sirkin (1973). Harper & Row, p. 504.

লেখক পরিচিতি

ডঃ অশোক কুমার ভট্টাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। ১৯৭৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূতত্ত্বে পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আগে ডঃ ভট্টাচার্য ১৯৭০ থেকে ১৯৮৭-র জুন পর্যন্ত কলকাতার যোগমায়া দেবী কলেজে ভূতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন।

এযাবৎ অধ্যাপক ভট্টাচার্যের লেখা ১১০-টির বেশি মৌলিক গবেষণাপত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর লেখা বেশ কিছু বিজ্ঞান প্রবন্ধ ভারত ও বিদেশ থেকে প্রকাশিত পুস্তকে আমন্ত্রিত পরিচ্ছেদ হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। ভারতসহ পৃথিবীর বহু দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর মৌলিক গবেষণাপত্র পাঠ করেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেশ কিছু বিজ্ঞান সংস্থার তিনি সদস্য।